ব্যায়ামে বাঙালী

‘শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্’

‘বীরত্বে বাঙালী’, ‘ব্রহ্মচর্য্য ও শক্তি-সাধনা’, ‘শঙ্করাচার্য্যের জীবনী ও বাণী’,
‘কেনারাম’, ‘ইংলণ্ডের ইতিহাস’, ‘সোনার বাঙ্‌লা’ প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম্, এ-প্রণীত

তৃতীয় সংস্করণ—পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত

প্রকাশক
শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম-এ
প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী
ঢাকা

[এক টাকা মাত্র

ঢাকা—নবাবপুর, নারায়ণ-মেশিন-প্রেসে শ্রীরাধাবল্লভ বসাকদ্বারা মুদ্রিত ১৩৩৮

সূচীপত্র

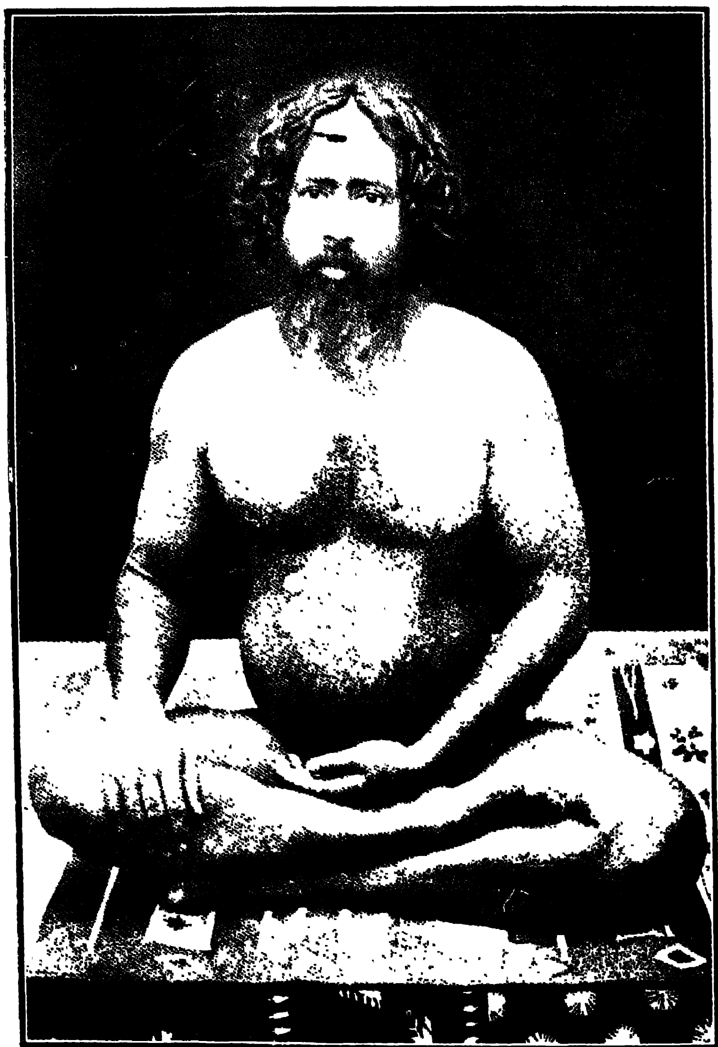
মল্লক্রীড়ায় (কুস্তিতে)

সাধারণ ব্যায়াম ও ক্রীড়া-কৌশলে

ধনুর্বিদ্যা ও ক্রীড়া-কৌশলে

অসিখেলায় বাঙালী

খেলা-ধূলায় বাঙালী



শ্যামাকান্ত সন্ন্যাসাশ্রমে (সোঽহং স্বামী)

শ্যামাকান্ত

বাঙ্‌লা দেশের শিক্ষিত ও তরুণ দলে যে দুই কৃতী পুরুষ শরীর-চর্চ্চা ও সাহসিকতার প্রথম প্রেরণা দিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের একজন স্বনামখ্যাত মল্লবীর শ্যামাকান্ত, আর একজন তাঁহারই সুহৃদ ও সহযোগী পরেশনাথ। ইঁহাদের পূর্ব্বে বাঙালীর শতমুখী প্রতিভার এই দিক্‌টা দেশের তরুণদের কাছে যেন রুদ্ধ ছিল। শিক্ষিত ও ভদ্র সমাজে উহার বড় একটা আদর ছিল না। শ্যামাকান্ত ও পরেশনাথের সাধনা ও তপস্যা তরুণ বাঙ্‌লার প্রাণে একটা নূতন আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিল, নব উৎসাহের দীপ্ত প্রদীপটি উজ্জ্বল করিয়া ধরিল। আত্মবিস্মৃত জাতির হৃদয়ে অতীতের গৌরব-স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। বাঙালী বুঝিল, জগতের বীর-সভায় তাহার আসনখানা কারো চেয়ে একটুও ন্যূন বা নীচু নয়।

শ্যামাকান্ত

সে বড় বেশী দিনের কথা নয়। সিপাহী-বিপ্লব শেষ হইয়া গিয়াছে। ইংরাজী ১৮৫৮ সাল, বাঙ্‌লা ১২৫৫ সন। এই বছর জ্যৈষ্ঠ মাসে স্বর্গীয় শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় জন্ম গ্রহণ করেন। শ্যামাকান্তের বাড়ী ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের আড়িয়ল গ্রামে। ইঁহারা ফুলিয়া মেলের বন্দ্যঘটী বংশীয়। বিক্রমপুর সমাজে অতি উচ্চ কুলীন বিষ্ণু ঠাকুরের পালটি বলিয়া এই বংশটির বিশেষ খ্যাতি আছে।

শ্যামাকান্তের বাবার নাম ৺ শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি ত্রিপুরা আদালতের সেরেস্তাদার ছিলেন। শ্যামাকান্তের ঠাকুর-দাদা ৺ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পুলিশের ইন্‌স্পেক্টার ছিলেন। শ্যামাকান্তেরা চারি ভাই, ইনিই জ্যেষ্ঠ। তাঁহার সব কয়টি ভাই-ই বেশ বলবান্ ও সুস্থ-সবল। তাঁহার বোন তিনটি। তাঁহার অন্যতম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সূর্য্যকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ঢাকার জজকোর্টের উকিল। ইনিও বেশ সুস্থ-সবল এবং বড় অমায়িক ও পরোপকারী।

শ্যামাকান্তের বাল্য জীবনের অনেক ঘটনায়ই তাঁহার নির্ভীকতা ও সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। যখন তাঁহার বয়স পনর বছর সেই সময়ে তিনি একদিন গ্রামের নিকটস্থ কোন হাটে তৈল কিনিতে যান। তৈলের মাপ লইয়া তৈল-বিক্রেতার সহিত শ্যামাকান্তের কথায় কথায় ঝগড়া বাঁধিয়া উঠে। শ্যামাকান্ত বলিলেন, ভাল করিয়া ঠিকমত মাপিয়া দাও, না হয় টাকা ফেরৎ

ভূমিকা

শরীর-চর্চ্চা জাতীয় শিক্ষার একটী অত্যাবশ্যক অঙ্গ। সকল দেশেই বালক ও যুবকগণের ব্যায়ামাদি শিক্ষার সুসঙ্গত বিধি-ব্যবস্থা আছে এবং এই উদ্দেশ্যে নানারূপ কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানাদির উদ্ভব হইয়াছে। সেদিনও ইংলণ্ডের 'জাতীয় ক্রীড়াভূমি সমিতি' তরুণদিগের জন্য একটী খেলার মাঠ সংগ্রহার্থ সাধারণের নিকট দেড় কোটী টাকার জন্য আবেদন করিয়াছেন। জার্ম্মানীতে জিলায় জিলায় 'ক্রীড়া পরামর্শ কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠিত আছে। 'ক্রীড়াই জাতীয় ব্যাধি অপসরণের মহৌষধ'—ইহাই হইয়াছে নব্য জার্ম্মানীর মূলমন্ত্র। কেবল আমাদের দেশেই এ সম্বন্ধে সংহত ভাবে কোন প্রচেষ্টা এ পর্য্যন্ত হয় নাই। সুশিক্ষার এই প্রয়োজনীয় অঙ্গটি অবহেলা করিয়া বাঙালী আজ কত না অপমান-অত্যাচার মাথা পাতিয়া সহ্য করিতেছে। আমরা যে-সমাজে বাস করি, তাহাতে ধন-প্রাণ মান-মর্য্যাদা লইয়া থাকিতে হইলে প্রত্যেকেরই আত্মরক্ষায় সক্ষম হওয়া প্রয়োজন।

মাতৃজাতির অবমাননা দর্শন করিয়াও যাহারা নীরব ও নিশ্চেষ্ট থাকে, মানুষের পঙ্‌ক্তিতে তাহাদের ঠাঁই কোথায়? তাই বলি, বাঙ্‌লার তরুণদল, অপরের উদাসীনতায় দোষারোপ করিয়া নিজেদের কাপুরুষতা ঢাকিতে চেষ্টা করিও না, সমাজের শোচনীয় অক্ষমতার বিষয় স্মরণ করিয়া তাহার প্রতিকারে কৃতসঙ্কল্প হও। এই অক্ষমতার কারণ পুরুষোচিত শক্তি-সাহসের অভাব। শরীরে শক্তি না থাকিলে মনে সাহস হয় না। সুতরাং সংযত সাধকের ন্যায় একনিষ্ঠ হইয়া শরীর-চর্চ্চা কর,

শক্তি সঞ্চয় কর। তোমাদের সংহত চেষ্টায় সমাজে প্রাণশক্তি জাগ্রত হইলে দুর্ব্বৃত্তের পাপাচার আপনিই অন্তর্হিত হইবে।

দেশে সংহত ভাবে শরীর-চর্চ্চা প্রচলিত না হইলেও আমাদের মধ্যে শক্তিসাধক কৃতী পুরুষের অভাব নাই। তাঁহারা আমাদেরই মত ডাল-ভাতে পরিপুষ্ট এবং একই জলবায়ুতে লালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াও অসাধারণ শক্তি-সামর্থ্য লাভ করিয়া জগতের শক্তিমানের বৈঠকে কীর্ত্তিধ্বজা তুলিয়া ধরিয়াছেন। সেই সমস্ত আদর্শ চরিতগুলি সম্মুখে রাখিয়াই আমাদিগকে শরীর-সাধনায় ব্রতী হইতে হইবে। এজন্য তাঁহাদের শিক্ষাদীক্ষা ও কর্ম্মজীবনের সহিত আমাদের পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। সেই পরিচয় প্রদানের উদ্দেশ্য লইয়াই এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানির জন্ম।

পত্রিকাদিতে নানা প্রবন্ধে কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যায়াম-বীরের সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা ইহার পূর্ব্বে সামান্যই আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থাকারে এবং ধারাবাহিক ভাবে বাঙলার ব্যায়াম-বীরদের জীবনী ইহাই প্রথম। ভরসা আছে, জাতির এত বড় দুর্দ্দিনে বাঙালী ইহা উপেক্ষা করিতে পারিবে না।

গ্রন্থশেষে সরল ব্যায়াম-প্রণালীর একটা স্বতন্ত্র অধ্যায় দেওয়া হইয়াছে। যাহাদের ব্যায়াম-চর্চ্চার কোন প্রকার সুযোগ-সুবিধা নাই, তাহারা এই প্রণালীতে ব্যায়ামাদি করিতে পারিবেন।

পরিশেষে এই গ্রন্থ-প্রণয়নে যাঁহারা আমাকে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। শ্রীযুক্ত গোবরবাবু, শ্রীযুক্ত ফণীবাবু, স্বর্গীয় মহেন্দ্রবাবু, শ্রীযুত রাজেনবাবু, শ্রীযুত ননীবাবু তাঁহাদের জীবন-কথা জানাইয়া আমাকে অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীযুত সূর্য্যবাবু তাঁহার ভ্রাতা ৺শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনী সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় বলিয়া বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন।

৺শ্যামাকান্ত বাবুর জীবনীর জন্য আমি শ্রীযুত বিষাদভূষণ দাসগুপ্ত এম-এ মহাশয়ের নিকট বিশেষ ঋণী। সুভাঢ্যাগ্রাম-নিবাসী ৺পরেশনাথের সম্বন্ধী শ্রীযুত অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ বি-এল্ মহোদয় ৺পরেশবাবুর জীবনী বলিয়া দিয়া অশেষ উপকার করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত অনেক পুস্তক-পত্রিকাদি হইতে এবং আরো অনেকের নিকট বহু সাহায্য পাইয়াছি। সে জন্য তাঁহাদের সকলের নিকট আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। পরিশেষে আমার যে সমস্ত অকৃত্রিম বন্ধু এই পুস্তকের জন্য নিজেদের সময় ও কাজ নষ্ট করিয়া পরিশ্রম করিয়াছেন, এবং উৎসাহ দিয়াছেন তাঁহাদিগের প্রতি আমার পরম কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। বস্তুতঃ ইঁহাদেরই চেষ্টা ও শ্রমে এই গ্রন্থখানা প্রকাশিত হইবার সুযোগ পাইয়াছে।

এই গ্রন্থের লভ্যাংশের কিয়দংশ কোন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে শরীর-চর্চ্চার উন্নতিতে ব্যয়িত হইবে।

অনেক দোষ-ত্রুটি এই বইতে অবশ্যই আছে। আমি যে-কয়টি জীবনী লিখিয়াছি তাহাদের দ্বারাই বাঙ্‌লাদেশের ব্যায়াম-বীরগণ নিঃশেষিত হন না। ইঁহারা ব্যতীত বাঙ্‌লাদেশে জীবিত ও মৃত, হিন্দু ও মুসলমান, আরো অনেক ব্যায়াম-বীর আছেন। তাঁহাদের জীবনী যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা জানাইলে সাগ্রহে ও সানন্দে গ্রহণ করিব ও পরবর্ত্তী সংস্করণে প্রকাশ করিব।

শ্রীমন্ মহাবীর কুস্তিগীরদিগের ইষ্ট দেবতা। তাঁহারই বীর্য্যপ্রদ পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া বাঙালী-জীবনে তাঁহার মঙ্গল আশিস্ মাগিতেছি। অয়ং আরম্ভঃ শুভায় ভবতু।

নিবেদক

বর্ষা, ১৩৩৪ সাল। শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'ব্যায়ামে বাঙালী'এত শীঘ্র আবার ছাপিতে হইতেছে দেখিয়া মনে হয় বুঝি বাঙালীর সুমতি ফিরিয়াছে। বাঙালীর জীবন স্বাস্থ্যে ও সৌন্দর্য্যে ভরপূর হউক, হৃদয়ে এই আশা লইয়াই বইখানা লিখিয়াছিলাম। আজ আমার আনন্দ এই, দেশের গুটিকয়েক ছেলেও শরীর-সাধনায় প্রকৃত সাধকের মত আত্মনিবেশ করিয়াছেন। বাঙালীর শরীর-সাধনায় এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি যদি কিছু-মাত্র সহায়তা করিতে পারে, তাহাতে আমার শ্রমের চরম সার্থকতা।

এই সংস্করণে বইখানায় কিছু কিছু নূতন বিষয়ের সমাবেশ হইয়াছে। 'তরুণ বাঙ্লার শারীর-সম্পদ্' বাঙ্লার তরুণ-জীবনে আশা ও উৎসাহ দিতে পারিবে, আশা করি।

চৈত্র, ১৩৩৫ } শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

ব্যায়ামে বাঙালী দ্বিতীয় সংস্করণ অনেকদিন হইল নিঃশেষিত হইয়াছিল। উপর্য্যুপরি নানা বিপৎপাতে যথাসময়ে ইহার নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিতে পারি নাই। এ ত্রুটী মার্জ্জনা সহৃদয় পাঠকগণ করিবেন। আশা করি, এ সংস্করণও দেশবাসীর নিকট বরণীয় ও আদরণীয় হইবে। বলা বাহুল্য, এ সংস্করণেও বইখানায় যথোচিত পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন সাধিত হইয়াছে। বাঙ্লার বাহিরে বাঙালী ব্যায়াম-বীর শীর্ষক প্রবন্ধে বর্ষাতি বাবুর জীবনীটুকু শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয়ের একটী প্রবন্ধ হইতে গ্রহণ করিয়াছি। তজ্জন্য তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

বৈশাখ, ১৩৩৮ } শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ

দাও। তৈল-বিক্রেতা সে কথা আমলই দিলনা, বরং আরো গরম হইয়া অন্যায়রূপ বচসা আরম্ভ করিল। তখন শ্যামাকান্ত খপ্ করিয়া তাহার টাকার থলিটা হস্তগত করিয়া একদৌড়ে গিয়া নৌকার উপর দাঁড়াইলেন। তৈল-বিক্রেতারা পাছে পাছে দৌড়িয়া আসিল। তখন উপায় ?—লাঠিখানাও হাতে ছিলনা। শ্যামাকান্ত নৌকার বৈঠাখানি লইয়া সেই সমস্ত ঝগড়াটে লোকদিগকে আক্রমণ করিলেন। ব্যাপার কিছু সঙ্গীন হইয়া উঠিল। কিন্তু বালক আর থামে না। অবশেষে স্থানীয় কয়েকজন ভদ্রলোক আসিয়া ঝগড়া মিটাইয়া দেন। তাহারা তৈল উচিতমত মাপিয়া দিল। শ্যামাকান্ত তাহাদের টাকার থলিটা ফিরাইয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে বাড়ী ফিরিলেন।

শ্যামাকান্ত ছোটকাল হইতেই স্বভাবতঃ বেশ সুস্থ-সবল ছিলেন। তার উপর ব্যায়াম-চর্চ্চার ঝোঁকটা তাঁহার চিরদিনই ছিল। তিনি যখন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে (তখন বর্ত্তমান কলেজিয়েট স্কুল ও ঢাকা কলেজ এক সঙ্গে ছিল) ভর্ত্তি হইলেন, তখন পূর্ণোদ্যমে ও অসীম উৎসাহের সহিত ঢাকা কলেজের বিশাল জিমনাসিয়ামে নানারকম ব্যায়াম আরম্ভ করিয়া দিলেন। ইঁহার পূর্ব্বে তিনি গ্রাম্য-পাঠশালায় পড়িতেন এবং কিছুকাল বাবার কর্ম্মস্থল মুরাদনগরে সেখানকার স্কুলেও পড়েন। লেখাপড়ার চেয়ে ডন-কস্‌রতের দিকেই যেন তাঁর নজরটা বেশী পড়িল। দুর্ব্বল বাঙালীর কঙ্কালময় ম্লান ছায়াটি তাঁর চোখের সাম্‌নে সব সময়েই

ভাসিতে থাকিত। সে দৃশ্য দেখিয়া তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। প্রতিজ্ঞা দৃঢ় করিলেন—জগতের বীরের সভায় বাঙালীর নাম ও মান রাখিবেন।

কলেজিয়েট স্কুলে পড়িবার সময়ই বিখ্যাত মল্লবীর পরেশ-নাথের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হয়। উভয়ে মিলিয়া লক্ষ্মী-বাজারের ৺অধর ঘোষের নিকট তাঁহারই আখড়ায় পূর্ণোৎসাহে কুস্তি-চর্চ্চা করিতে থাকেন। আখড়ার লাল মাটীতে দুইটি বন্ধুকে এমন অভিন্ন সূত্রে গাঁথিয়া তুলিয়াছিল যে একজনের নাম করিলে লোকে আজিও উভয়ের কথা স্মরণ করিয়া চোখের জল ফেলে। আজিও বন্ধুত্বের স্মৃতিমাখা সেই আখ্ড়া, সেই লালমাটী ঢাকা সহরে বর্ত্তমান রহিয়াছে, কিন্তু সেই ল্যাঙট্-পরা লালমাটীতে-রাঙা-দেহ বন্ধু দুইটির অভাবে সেখানকার বাতাসও যেন হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া গুমরিয়া ফিরিতেছে। ঢাকা অঞ্চলের পালোয়ানেরা লাল টক্‌টকে মাটীতে কুস্তি লড়িয়া থাকেন, কলিকাতার মত কালো গঙ্গার মাটী এখানে নাই। শ্যামাকান্ত যখন সেই লাল মাটিতে কুস্তি লড়িয়া মাটি-মাখা শরীরখানা লইয়া উঠিতেন, তখন সেই বিশাল শুভ্র গৌরবর্ণ দেহটি দেখিয়া মনে হইত, তেজ ও বীর্য্য যেন ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছে। শুনা যায় শ্যামাকান্তের "পুট্টি" প্যাঁচটি নাকি খুব সাফাই ছিল। যাহাকে-তাহাকে পুট্টি মারিয়া কাবু করিয়া

দিতে পারিতেন। তিনি এই সময় অনেক পেশাদার পাঞ্জাবী পালোয়ানদিগকে কুস্তিতে চিৎ করিয়া হারাইয়া দিয়াছেন।

শ্যামাকান্ত পরিমিত ও স্বল্পাহারী ছিলেন। তবে কুস্তি-চর্চ্চার সময় তাঁহাদের ওস্তাদ ৺অধর ঘোষ নাকি আধ মণ দুধের মালাই তাঁহাকে ও পরেশনাথকে খাওয়াইতেন। সে সময়ে অধর ঘোষের অবস্থা খুব স্বচ্ছল ছিল।

পাঠ্যাবস্থায়ই তাঁহার সৈনিক হওয়ার খুব সখ হয়। তখন যৌবনের প্রথম উন্মেষমাত্র। জীবনটা তখনও স্বপ্নরাজ্যে। এখনকার ছেলেদের যেমন ইচ্ছা হয়, একজন সৈনিক হইয়া নেপোলিয়ান বা গ্যারীবল্ডীর মত নাম করা, শ্যামাকান্তেরও মনে তখন এই সঙ্কল্পই জাগিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে সেনা হওয়া বা যুদ্ধবিদ্যা শিখার সখটা বাঙ্গালীর পক্ষে একটা বে-আইনী বে-আদবী। কি করেন, ইংরেজ সরকার তো তাঁহাকে সেনা-বিভাগে ঢুকিতে দিবেন না। কাজেই শ্যামাকান্ত ও পরেশনাথ—দুই বন্ধুতে মিলিয়া জটলা করিলেন। পরামর্শ হইল, কোন দেশীয় রাজ্যে যাইয়া সৈনিক বিভাগে ঢুকিয়া যুদ্ধবিদ্যা শিখিবেন। একদিন দুই বন্ধুতে বাড়ী ছাড়িয়া পশ্চিমে রওনা হইলেন। গোয়ালিয়র প্রভৃতি দেশীয় রাজ্য ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলেন। কিন্তু ঐ সমস্ত সৈনিক বিভাগে যে ঘৃণিত দাসত্বপরায়ণতা ও দুর্নীতি দেখিতে পাইলেন, তাহাতে তাঁহাদের সেনা হইবার সাধ মিটিল, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসিলেন।

ইহার পূর্ব্বেও আফগান যুদ্ধের সময় আর একবার শ্যামাকান্ত উত্তর ভারতটা ঘুরিয়া আসিয়াছিলেন। তখনও এই মতলবই ছিল, যদি আফগান যুদ্ধে লড়াই করিতে যাইতে পারেন।

পশ্চিম হইতে ফিরিয়া আসিলে শ্যামাকান্তের মা ধরিয়া বসিলেন, ছেলেকে বিবাহ করিতেই হইবে। শ্যামাকান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও মায়ের অনুজ্ঞা এড়াইতে না পারিয়া বিবাহ করিলেন। বিবাহ বিক্রমপুরেই নিষ্পন্ন হইল।

বিবাহের কয়েক মাস পর শ্যামাকান্ত একবার আগড়তলা বেড়াইতে যান। আগড়তলা ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী। মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর তখন ত্রিপুরার রাজা। শ্যামাকান্তের শারীরিক শক্তি ও ব্যায়াম-পটুতার কথা তিনি আগেই শুনিয়াছিলেন। এখন তাঁহার ব্যায়াম-কৌশল ও দৃঢ় বলিষ্ঠ শরীর দেখিয়া তাঁহাকে নিজের পার্শ্বচর নিযুক্ত করিতে চাহিলেন। শ্যামাকান্ত পিতার নিকট লিখিলেন। তারপর পিতার অনুমতি পাইয়া মহারাজের সহচর নিযুক্ত হইলেন। মহারাজ শ্যামাকান্তকে তখন হইতেই খুব স্নেহের চক্ষে দেখিতেন এবং তাঁহার যখন যাহা-কিছু দরকার হইত তখনি তাহা দিতেন। শ্যামাকান্ত দুই বছর মহারাজের কাছে থাকেন। তারপর কোন বিষয়ে মতভেদ হওয়ায় সে কাজ ছাড়িয়া দিলেন। ত্রিপুরা ছাড়িলেও ত্রিপুর-রাজ তাঁহাকে ভুলেন নাই। শ্যামাকান্ত যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন মহারাজের অনুগ্রহ ও অনুরাগ হইতে

কখনও বঞ্চিত হন নাই। পরবর্ত্তী কালে যখনই তিনি তাঁহার সার্কাস লইয়া আগরতলা গিয়াছেন সব সময়েই মহারাজ বাহাদুর তাঁহাকে সমাদর করিয়া নিতেন এবং পুরস্কৃত করিয়া সম্মানিত করিতেন।

আগড়তলা ছাড়িয়া শ্যামাকান্ত বরিশাল জিলা স্কুলে আসিয়া ব্যায়াম-শিক্ষক নিযুক্ত হন। এই সময়ই তিনি একটি সার্কাসের দল গড়িতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সকলেই তাঁহাকে এ কাজ করিতে নিষেধ করেন। সকলেই বলিলেন, এ কাজে বিপদের সম্ভাবনা ও জীবনের আশঙ্কা খুব বেশী। কিন্তু স্বাধীন-চেতা শ্যামাকান্ত মরণ-বাঁচনকে বড় বেশী একটা গ্রাহ্য করিতেন না। তাই আঠার বছরের যুবক এমনতর কাজে লাগিতে পারিয়াছিলেন। এই সময়ে শ্রীহট্ট জেলার সুনামগঞ্জে তিনি একটী চিতা বাঘ ক্রয় করিলেন। এইটীই তাঁহার প্রথম বাঘ। আফিং বা কোন মাদক দ্রব্যের দ্বারা অনেকে বাঘ বশ করিয়া থাকে। সুপ্রসিদ্ধ ডনগীর স্যাণ্ডো একবার এক সিংহের সহিত লড়াই করিয়াছিলেন। সে সিংহটীর থাবা মুখ প্রভৃতি মারাত্মক অঙ্গগুলি চামড়া দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছিল, এবং উহার নখ কাটিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু শ্যামাকান্ত ও-সব ভড়ং-কায়দার ধার ধারিতেন না। তিনি সোজা খাঁচার ভিতর ঢুকিতেন, তারপর জোর জবরদস্তি করিয়া রীতিমত লড়াই জুড়িয়া দিতেন। এমন করিয়া দুই

মাস মধ্যেই সেই বাঘটাকে বশ করিয়া সেই সুনামগঞ্জেই উহার সহিত খেলা জুড়িয়া দিলেন। বাঘের খেলায় এই তাঁর প্রথম চেষ্টা, এবং সে চেষ্টা সফল হইল। এই বাঘটা বশ করিতে তাঁহাকে অনেকবার নখ ও দন্তাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইতে হইয়াছে। ধীরে ধীরে তাঁহার সাহস ও মনের জোর বাড়িল, অভিজ্ঞতা জন্মিল, এখন তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ভীষণ বন্য ব্যাঘ্র সিংহ প্রভৃতি যে কোন হিংস্র জন্তু বশ করিতে পারিতেন। হাসিতে হাসিতে পিঞ্জর মধ্যে ঢুকিয়া এই সকল হিংস্র জন্তুর সহিত রোমাঞ্চকর খেলা করিতেন। শ্যামাকান্তের চোখের তীব্র চাহনিতে বাঘ যেন আপনি নিস্তেজ হইয়া পড়িত।

এখন হইতে দেশময় শ্যামাকান্তের নাম পড়িয়া গেল। এই সময়ে ভাওয়ালের জয়দেবপুরের রাজা একটী সুন্দরবনের "রয়েল বেঙ্গল" বাঘ ধরিয়া আনেন। ঐ বাঘটী তিনি শ্যামাকান্তের শক্তি ও সাহসের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে দান করেন। ভাওয়াল-রাজ তাঁহাকে আরো একটি বাঘ পুরস্কার দিয়াছিলেন।

শ্যামাকান্তের হাত দুইটিতে অসাধারণ জোর ছিল এবং মনে অমানুষিক বল ছিল। তাই তিনি হিংস্র বাঘের সঙ্গে এমন নির্ভীক ভাবে লড়িতে পারিতেন। বাঘের থাবায় কত জোর রাখে, একটি গল্প বলি। ভাওয়াল-রাজ যে বাঘটা উপহার দিয়াছিলেন সেই বাঘটা শ্যামাকান্ত ট্রেনে চাপাইয়া ঢাকা লইয়া

আসিলেন এবং পরেশনাথের বর্ত্তমান আখড়ায় উহাকে শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখিলেন। এই বাঘটার নাম ছিল গোপাল। বাঘটার নিকটেই পরেশনাথ বসিয়া আছেন এবং বাঘের শরীরে কি রকম জোর থাকিতে পারে সেই সব কথাবার্ত্তা চলিতেছে। পরেশনাথ বাঘের সহিত কোন দিন খেলাও করেন নাই, বাঘের শক্তি সম্বন্ধেও তাঁহার কোন ধারণা ছিল না। কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় বাঘটা হঠাৎ উঠিয়া পরেশনাথকে এমন একটা চাপড় মারিল যে তিনি তৎক্ষণাৎ ছিট্‌কাইয়া পড়িয়া গেলেন। বাঘের একটি থাবায় কেমন জোর! চারি মণ ওজনের মানুষটি এক চাপড়েই একেবারে কাৎ!

শ্যামাকান্ত তাঁহার সমস্ত হাতখানি জ্যান্ত বাঘের মুখে ঢুকাইয়া দিতেন। বাঘটা হাতে দেড় ইঞ্চি দুই ইঞ্চি নখর এমন বিঁধাইয়া দিত যে টস্ টস্ করিয়া রক্তের ধারা গড়াইয়া পড়িত। কিন্তু তিনি উহা এমন ধীর ভাবে সহ্য করিতেন যে বাঘকেও বুঝিতে দিতেন না যে সে কামড় দিয়াছে। ইহা দেখিয়া একবার কাশীতে এক সাহেব-সৈনিক বলিয়াছিলেন—আমি একজন সৈনিক, মরণকে কোন দিন ভয় করিনা। কিন্তু দুনিয়ার সমস্ত মেডেল আমাকে দিলেও আমি এমন বিপজ্জনক কাজ করিতে রাজী নই।

একবার শ্যামাকান্ত বাঘের খেলা দেখাইতে গৌরীপুর যান। সে বাঘটার নাম ছিল রাজা এবং বাঘটাও খুব দুর্দ্দান্ত ছিল।

এ বাঘটাও ভাওয়াল-রাজের প্রদত্ত। শ্যামাকান্ত সাধারণতঃ এক দরজাওয়ালা খাঁচার ভিতর বাঘের সঙ্গে খেলিতেন। এ খাঁচায় খেলাটা একটু বিপজ্জনক। শ্যামাকান্ত খেলা শেষ করিয়া যেই পশ্চাতে হটিয়া বাহিরে এক পা বাড়াইয়াছেন অমনি বাঘটা তাঁহার মুখে এক থাবা মারিয়াছে। তিনি দেখিলেন, বড়ই বিপদ। যদি তিনি বাহির হইয়া আসেন তবে বাঘও সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিবে। কারণ খেলা শেষ হওয়ার সঙ্কেত শুনিয়াও বাঘটাকে শিকল দিয়া আটকাইয়া দেওয়া হয় নাই। অথচ বাহিরে এত লোক—বাঘ ছুটিলে আর রক্ষা নাই। তিনি তখন আবার ধীর ভাবে খাঁচায় ঢুকিলেন এবং উপর হইতে শিকল ফেলিয়া বাঘটাকে বাঁধিতে ইঙ্গিত করিলেন। তারপর শিকল পড়িবামাত্র এক ধাক্কা দিয়া বাঘটাকে ফেলিয়া দিয়া খাঁচার বাহির হইয়া আসেন।

চুঁচূড়ায়ও একবার এমনতর একটি ঘটনা হয়। সেবার শ্যামাকান্ত বাঘের মুখে মাংসের টুক্‌রা ফেলিয়া শান্ত ভাবে মাথা বাঁচাইয়া সরিয়া পড়েন।

এমন ধীর ও শান্ত ভাবে অসীম সাহসিকতার পরিচয় মনের উপর কত বড় আধিপত্য জন্মিলে সম্ভবপর হয়, ভাবিবার বিষয়। শ্যামাকান্তের মন তাঁহার সম্পূর্ণ আত্মবশে ছিল।

একবার পাটনার নবাব একটা প্রকাণ্ড বাঘিনী ধরেন। শ্যামাকান্তকে এই বাঘিনীটার সহিত কুস্তি লড়িতে আহ্বান করা হয়—পুরস্কার দু'হাজার টাকা! এমন একটা বন্য হিংস্র জন্তুর



শ্যামাকান্ত (যৌবনে)

সহিত মানুষ লড়িতে পারে ইহা কাহারও বিশ্বাস ছিল না। দেশময় এ সংবাদ রটিয়া গেল,—কাগজে কাগজে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। সহর ভাঙ্গিয়া লোক দলে দলে খেলা দেখিতে ছুটিল। মনে হইল, আবার বুঝি রোমের বিলাসী নরনারীর সাধের সেই গ্ল্যাডিয়েটারদের খেলা ফিরিয়া আসিল। এই উৎকণ্ঠিত বিশাল জনসঙ্ঘের সম্মুখে বাঙ্লার তেজীয়ান্ যুবক বীর শ্যামাকান্ত তাঁহার শুভ্র বিরাট দেহখানি লইয়া যখন সেই আঙিনায় আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন চারিদিকে তাঁহার জয়ধ্বনি উঠিল, সেই বিশাল জনসঙ্ঘ কোলাহলে মুখরিত হইল—তারপর সব নীরব নিস্তব্ধ! সকলের মুখে-চোখেই উদ্বেগের ভাব, কি যেন কি হয়। অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তির পর সেই বন্য বাঘিনীটাকে মেষ-শাবকের মত পদদলিত করিয়া সেই বিশাল জনসঙ্ঘের মধ্যে যখন তরুণবীর শ্যামাকান্ত গর্ব্বিত বক্ষে দাঁড়াইয়া উঠিয়া জয়োন্নত মস্তকে অভিনন্দন জানাইলেন—অমনি আবার হাজার কণ্ঠে জয়ধ্বনি পড়িয়া গেল। নবাব বাহাদুর নগদ দু'হাজার টাকা, দুইটি আরব দেশীয় ঘোড়া এবং সেই সদ্যোধৃত বাঘিনীটা শ্যামাকান্তকে দান করিলেন। এই বাঘিনীটার নাম ছিল বেগম।

১৮৯৪ সালে শ্যামাকান্ত মাসিক ১৫০০৲ শত টাকা বেতনে ফ্রেড্‌কুকের ইংলিশ সার্কাসে হিংস্র জন্তুর খেলা দেখাইবার জন্য নিযুক্ত হন। সে সময় ঐ সার্কাসওয়ালাদের মধ্যে তিনি

শারীরিক শক্তি ও সাহসে সকলের চেয়ে বড় ছিলেন। এক বৎসর কাজ করিবার পর তিনি চাকুরী ছাড়িয়া দেন। ইহার পর তিনি তাঁহার নিজের সার্কাস দল লইয়াই নানা যায়গায় ঘুরিয়া বেড়ান। ক্রমে তিনি রামগোপালপুর, কুচবিহার, ঢাকা, কলিকাতা, পাটনা, রংপুর, আগড়তলা প্রভৃতি স্থানে খেলা দেখান। একবার কিছুদিন তিনি রংপুর অবস্থান করেন। সেখানে এক তেতালা বাড়ীর নীচে তাঁহার পশুশালা ছিল। ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে ঐ বাড়ী পড়িয়া যায়, তাহাতে ঘোড়া, বানর, কুকুর, ভল্লুক প্রভৃতি জন্তু ও সার্কাসের সমুদয় আসবাব-পত্র নষ্ট হইয়া যায়। দুইটী বাঘ বাহিরে ছিল বলিয়া বাঁচিয়া যায়। এই বাঘ দুইটী লইয়া বছর খানেক কলিকাতা ও নিকটবর্ত্তী স্থানে বাঘে কুকুরে খেলা, বাঘের সহিত কুস্তি এবং অন্যান্য খেলা দেখান। পরে "Grand Show of Wild Animals" নাম দিয়া একটা বড় ও নূতন রকমের খেলা আরম্ভ করেন। ইহাতে হাতী, কতকগুলি বাঘ, বানর ও কুকুরের খেলা ছিল। ইহাই তাঁহার কর্ম্ম-জীবনের শেষ খেলা।

শ্যামাকান্তের খেলার মধ্যে বুকে পাথর ভাঙ্গা ছিল এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। আমাদের দেশে শ্যামাকান্তই সর্ব্বপ্রথম এই খেলা দেখাইয়া বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করেন। সেকালের সংবাদ পত্রের পৃষ্ঠায় আমরা দেখিতে পাই—প্রোফেসার ব্যানার্জ্জির এই সমস্ত রোমাঞ্চকর খেলার কাহিনী—

“পদে মস্তকেতে উচ্চ উপাধান
অবশিষ্ট দেহ শূন্যেতে রয়।
ঐ এক যুবা রয়েছে শয়ান,
পৃষ্ঠের আশ্রয় কিছু না হয়।
হেন অবস্থায় বৃহৎ প্রস্তর
দিয়াছে যুবার বক্ষের উপরে ;
লৌহময় এক ধরিয়া মুদ্গর
সবলে অপরে প্রহার করে।
অদ্ভুত ব্যাপার! ভাঙ্গিল প্রস্তর!
ব্যথিত না হ'ল যুবার দেহ!
দৈত্য কি দানব হবে এই নর!
অসুর বিনা কি সহে এ কেহ?”

এই বুকের উপর পাথর ভাঙ্গার কসরতে তাঁর সব চেয়ে বেশী নাম হয়। “ঘাড়ের নীচে একখানা চেয়ার, আর পা দুটীর নীচে আর একখানা চেয়ার রাখিয়া তিনি দেহটীকে ঠিক একটী সাঁকোর মত করিয়া রাখিতেন, আর তাহার উপরে ১২।১৪ মণ পাথর চাপাইয়া দেওয়া হইত। তারপর যে কেহ এক প্রকাণ্ড লোহার হাতুরি দিয়া সেই পাথরের উপর ঘা মারিতে থাকিত।” ঘা খাইয়া পাথর ভাঙিয়া গুড়া হইয়া যাইত, কিন্তু সে পাষাণ বক্ষ টলিত না। শ্যামাকান্ত সাধারণতঃ ৮ হইতে ১২ মণ পর্য্যন্ত ওজনের পাথরই ব্যবহার করিতেন ; কিন্তু ছোটলাটের বাড়ীতে একবার খেলা

দেখাইবার সময় ১৪ মণ ওজনের পাথর বুকে লইয়াছিলেন। কয়েকজন জবরদস্ত গোরা সেনা বক্ষঃস্থিত প্রস্তর খণ্ডের উপর প্রকাণ্ড মুগুরের ভীষণ আঘাত করিয়াও তাঁহাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই।

শ্যামাকান্ত আর একটি বড় আশ্চর্য্য খেলা খেলিতেন। শূন্যে পা-দুটা হুকে সংলগ্ন করিয়া তিনি সমস্ত শরীর নীচে ঝুলাইয়া দিতেন। তারপর মাটী হইতে চারি জন বলিষ্ঠ লোককে উপরে তুলিয়া উঠাইতেন।

বিশ্ব-বিখ্যাত ব্যায়ামবীর স্যাণ্ডো যখন এ দেশে আসিয়াছিলেন, তাহাকে দেখিয়া শ্যামাকান্ত ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন—"এ তো কতকগুলি muscleএর (মাংসপেশীর) পিণ্ডি।" তখন একজন বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন,"আপনি ওর সাথে পারবেন ?" শ্যামাকান্ত অম্লান বদনে উত্তর দিলেন, "সেটা কুস্তি লাগিয়ে দিলেই বুঝতে পারবেন।"

স্যাণ্ডোর সাথে এলমো (Elmo) নামে তাহারই মত মস্ত জোয়ান এক পালোয়ান আসেন। কলিকাতা গড়ের মাঠে এলমোর সহিত তাঁহার মুষ্টি-যুদ্ধ (Boxing) হয়। তিন মিনিট খেলার পর শ্যামাকান্ত তাহাকে এমন এক আছাড় মারিয়াছিলেন যে ১৫ মিনিট তাহার চৈতন্যই হয় নাই। বাঙালীর মান-সম্ভ্রম এমন ভাবে ধরিয়া তুলিতে পারায় সেই বিশাল জনসঙ্ঘের বাঙালী-কণ্ঠে শ্যামাকান্তের জয়-জয়কার পড়িয়া গেল। কিন্তু মেম

সাহেবেরা চটিয়া লাল, তাহারা চেঁচাইয়া উঠিলেন, "That's illegal." ওটা অন্যায়, বিধি-বিরুদ্ধ। শ্যামাকান্ত গর্ব্বিত কণ্ঠে জবাব দিলেন, "He can stand the shock of being thrown away. But from the standpoint of a boxer I purposely avoided the calumny of being a murderer."—ফেলে দেয়েছি, সে ধাক্কাটা উনি সহ্য করতে পারবেন বলেই, পাছে নর-ঘাতক হই এই অখ্যাতিটা এড়াবার জন্যই বেশী চোট্ দি নাই, সেটা মুষ্টি-যুদ্ধের নিয়ম নয়।

একদিন ঢাকায় ৺পরেশনাথ ঘোষ, ৺বসন্তদেব চৌধুরী প্রভৃতি বন্ধুদিগের সম্মুখে শ্যামাকান্ত ১৪ মণ ওজনের একটা কামানের ন্যায় বিপুলাকৃতি লৌহ-খণ্ডকে মাথার উপর তুলিয়া উহা কয়েক-বার ভাজিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়াছিলেন।

শ্যামাকান্তের মুষ্টিতে এত জোর ছিল যে দেয়ালের গায়ে ঘুসি দিলে চূণ সূরকী ও ইটের গুড়া ঝুর ঝুর করিয়া ভাঙিয়া পড়িত।

একবার শ্যামাকান্ত গোয়ালন্দ হইতে ষ্টীমারে ঢাকা আসিতে-ছিলেন। সেদিন খুব কুয়াসা করিয়াছে। শ্যামাকান্ত ষ্টীমারের নীচের তলায় গায়ের নূতন কোর্টটি অতি সন্তর্পণে বাঁচাইয়া কলে হাতমুখ ধুইতেছিলেন। এমন সময়ে শুনিলেন উপরে একটা হল্লা হইতেছে। দেখিলেন, দলে দলে খালাসীরা হাতা ডাণ্ডা লইয়া উপরে উঠিতেছে, জাহাজ পদ্মার মাঝখানে থামিয়া রহিয়াছে।

তিনি তাড়াতাড়ি উপরে গেলেন। শুনিলেন, কোন মহিলা-যাত্রীর প্রতি অত্যাচার করিতে সারেঙ দল-বদ্ধ লইয়া জটলা করিয়াছে। তাহাতেই এই হাঙ্গামা বাঁধিয়াছে। মহিলার স্বামীও জাহাজে আছেন। তিনি ত একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গিয়াছেন। এতগুলি দস্যুর সহিত তিনি একা কি করিবেন! শ্যামাকান্ত তখন সারেঙকে কঠোর কণ্ঠে বলিলেন—এই, কেয়া হুয়া ? সারেঙ তখন বোধ হয় নেশায় বিভোর—সে 'তুই 'কে রে ? বলিতেই তাহার এক সহকর্ম্মী শ্যামাকান্তের হাতে একটা আঘাত মারিল, হাতটা কাটিয়া গিয়া দর্ দর্ করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। রুদ্রমূর্ত্তি শ্যামাকান্ত তখন গায়ের কোটটা ছাড়িয়া ফেলিয়া বাঘের মত উহাদিগকে একযোগে আক্রমণ করিলেন। সারেঙ্টাকে এক লাথি মারিয়া লোহার ডাণ্ডার ঘায়ে শোয়াইয়া দিলেন। তারপর বাকীগুলিকে ধাওয়া করিতে করিতে নীচে নামাইয়া দিলেন।

এই যে কাণ্ড হইতেছে, জাহাজের সমবেত যাত্রীগুলি কেবল নির্ব্বাক হইয়া হাঁ করিয়া দেখিতেছে—যেন চিত্র-পুত্তলিকা, রক্ত-মাংস-প্রাণহীন জড়পিণ্ড! একটী লোকও তাঁহার সহযোগিতা করিতে আসিল না। ইহা দেখিয়া শ্যামাকান্ত ক্রোধে, ক্ষোভে, লজ্জায় যেন অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি একখানি বেত লইয়া তাহাদিগকেও তাড়া করিলেন, বলিলেন—ভীরুর দল, মা-বোনের তোদের ইজ্জত যায়, আর তোরা এতগুলি লোক হাঁ করে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখছিস্! দড়ি-কলসীও জুটেনা তোদের!

মহিলা-যাত্রীর স্বামী (একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট) গোল মিটিলে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাইয়া দু-কথা বলিতে লাগিলেন।

শ্যামাকান্ত বলিলেন—সে সব কিছু বলিতে হবে না, আমার বোধ হয় আপনার বিবাহ করাটাই একটা মস্ত ভুল হইয়াছে। যাদের নিজের স্ত্রীর মান রক্ষা করিবার সামর্থ্য নাই তাদের বিবাহ করা উচিত নয়।

আর একবার পশ্চিম অঞ্চলে এক ট্রেনে এক বাঙালী মুন্সেফ বাবু তাঁহার ভার্য্যা লইয়া যাইতেছিলেন। দিনাপুর ষ্টেশনের নিকট তিনজন গোরা এই ভদ্র-মহিলার অবমাননার চেষ্টা করে। এমন সময় যমের মত শ্যামাকান্ত আসিয়া এই তিনটি গোরাকে আক্রমণ করিলেন। তিনি একক তিনজনের সঙ্গে সমানে ঘুষি চালাইলেন। শ্যামাকান্তের বজ্র-মুষ্টির আস্বাদ পাইয়া তিনটি দৈত্য তিনদিকে ছিট্‌কাইয়া পড়িল। মুন্সেফ-পত্নীর মর্য্যাদা রক্ষা পাইল।

শ্যামাকান্ত একবার আগরতলায় যে বিষম কাণ্ড বাঁধাইয়া ছিলেন, তাহা শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ডি-লিট্ মহাশয়ের লেখনীতে অমর হইয়া রহিয়াছে। সে সময়ে দীনেশবাবুও আগরতলায় ছিলেন। ঘটনাটি এই—“মহারাজার প্রাসাদে সিঁড়ির কাছে মণিপুরী সৈন্য সঙ্গীন লইয়া পাহাড়া দেয়। শ্যামাকান্ত তাঁহার ভীষণ-দর্শন একটা কুকুর লইয়া সেই সিঁড়ির কাছে উপস্থিত হয়। রাধারমণ বাবু (প্রাইভেট্ সেক্রেটারী) বলিলেন, “মহারাজার

সঙ্গে আজ সাক্ষাৎ হবে না।” সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া সে কুকুরসহ সিঁড়িতে উঠিতে থাকে। মণিপুরী সশস্ত্র প্রহরী তাঁহাকে বাঁধা দেয়। তখন তাহাদের দুই তিন জনের সঙ্গীন কাড়িয়া লইয়া সে সেখানে একটা বিষম হল্লা বাধাইয়া দেয়। কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করিয়া প্রভুর পক্ষ সমর্থন করিয়া তারস্বরে চীৎকার করিতে থাকে। এই অশ্রুতপূর্ব্ব কলরবে প্রাসাদের সকলে শঙ্কিত হইয়া উঠে। মহারাজ কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান এবং যখন ঘটনাটি শুনিলেন,তখন রাধারমণ বাবুকে বলিলেন,—“ওর ভয়ে আমি সর্ব্বদা অস্থির থাকি, ওকে কেন ঠেকিয়ে রাখলে, আসতে দাও।”

শ্যামাকান্ত যাইয়া মহারাজকে বলিল, “মহারাজ, আমি বাঘের মুখে হাত ঢুকাইয়া তাহা ফিরাইয়া আনিতে শিখিয়াছি, নরখাদক ভীষণ বাঘকে পোষ মানাইয়াছি। মহারাজকে খেলা দেখাইব—আদেশ করুন।” মহারাজ বলিলেন, “তুমি কি চাও বল, আমি বাঘের মুখে ব্রহ্মহত্যা দেখতে মোটেই রাজী নই। তুমি কি হলে আমায় ছাড়বে তাই বল।” শ্যামাকান্ত বলিলেন, “মহারাজ, আমি আপনাকে খেলা দেখাইব বলিয়া এতদূর আসিয়াছি। সে আশা যদি পূর্ণ না করেন, তবে আমার এই থলিয়াটি পূর্ণ করিয়া দিন,ইহাতে হাজার দুই টাকা ধরিতে পারে।” মহারাজ তখনই দুই হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়া দিলেন।

ছোটকাল হইতেই শ্যামাকান্ত ধর্ম্মপিপাসু ছিলেন। ধর্ম্মের

বীজ বাল্যেই তাঁহার জীবনে উপ্ত হইয়াছিল। ত্রিপুরা জেলায় ল্যাংটা বাবা বা পাগলা বাবা নামে এক প্রাচীন সন্ন্যাসী ছিলেন। ইঁহার ব্যবহার বা কথাবার্ত্তায় কেহ কোনদিন বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই, ইনি কোন্ জাতীয় বা কোন্ ধর্ম্মীয়। এই মহাত্মার সহিত শ্যামাকান্তের বাবার সাক্ষাৎ হয় এবং সেই উপলক্ষে শ্যামাকান্তও ইঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। এই তাঁহার ধর্ম্মজীবনের সূত্রপাত।

১৮৯৯ সালে শ্যামাকান্তের বাবা মারা যান। ইহার পরই তিনি বাড়ী ছাড়িয়া তীর্থ-ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়েন। তখন তাঁহার বয়স ৪২ বছর, স্ত্রী ও কন্যা বর্ত্তমান। গৃহত্যাগ করিয়া তিনি কাশী, নৈমিষারণ্য, হরিদ্বার প্রভৃতি নানা তীর্থস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

তিনি যখন কাশী ছিলেন তখন সেখানে এক বৃদ্ধ বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ইঁহার আদি নাম নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বাড়ী শ্রীহট্ট জেলায়। ইনি ষোল বছরের সময়ে সন্ন্যাসী হইয়া তিব্বত, চীন, শ্যাম, ব্রহ্মদেশ এবং সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরিয়া বেড়ান। ইনি ৩২ বছর তিব্বতে ছিলেন বলিয়া সাধারণের নিকট তিব্বতীবাবা বলিয়াই বিখ্যাত। ইঁহারই নিকট শ্যামাকান্ত দীক্ষিত হন এবং ইনি সর্ব্ব সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদিগকে আহ্বান করিয়া সর্ব্বসমক্ষে শ্যামাকান্তকে "সোঽহংস্বামী" এই নাম দেন। সেই হইতে সন্ন্যাসী শ্যামাকান্ত সোঽহংস্বামী বলিয়াই পরিচিত।

ইহার পর হইতে সোঽহংস্বামী নাইনিতালের সাত মাইল

দূরবর্ত্তী হিমালয়ের কোলে ভাওয়ালী নামক স্থানে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া বাস করিতেন। আশ্রমটী শশ্মানভূমির নিকটবর্ত্তী, পাশে কলকল স্বরে নির্ঝরিণী বহিয়া যাইতেছে—প্রকৃতির শোভাসম্পদে চারিদিক্ ঘেরা।

এই আশ্রমে বাস করিবার সময় একদিন শ্যামাকান্ত বেড়াইতে বাহির হইয়া দেখেন, দূরে কতকগুলি পাহাড়ীলোক হল্লা করিতেছে। নিকটে গিয়া দেখিলেন, একটি গোরা ছোরা লইয়া উহাদিগকে মারিতে উঠিয়াছে। তিনি অনেক বুঝাইলেন, গোরাটা মদের নেশায় বিভোর, কার কথা কে শুনে? তখন শ্যামাকান্ত জোর করিয়া গোরাটাকে ধরিয়া আনিয়া আশ্রমে বাঁধিয়া ফেলিয়া রাখিলেন। পরদিন ভোরে তাহাদের অফিসারের নিকট সকল কথা বলিয়া দিয়া আসিলেন।

এই সময় শ্যামাকান্ত অনেকগুলি বই লিখেন। এই সমস্ত বইতে তাঁহার গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে সোঽহংগীতা, সোঽহংতত্ত্ব, সোঽহং-সংহিতা, বিবেকগাথা, Truth, ভগবদ্গীতার সমালোচনা—এই কয়খানাই প্রধান। তিনি মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে গীতার সমালোচনা লিখিয়া যান।

সাধন পথে তিনি ছিলেন বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদী,জ্ঞানমার্গাবলম্বী। উহার স্থূল মর্ম্ম এই যে, জীব-জগতের ব্যবহারিক সত্তা থাকিলেও পারমার্থিক সত্তা নাই। "এক চৈতন্য উপাধিযোগে বহুরূপে পরিলক্ষিত হইতেছে। উপাধি-বিনির্ম্মুক্ত হইলে এক চৈতন্য

মাত্র অবশিষ্ট থাকে। সেই চৈতন্য দ্বৈতভাবে উপাস্য নহেন।" উহা সাধনবলে নিজবোধগম্য।

তিনি এই শত-বিচ্ছিন্ন ভেদবাদী জাতির মধ্যে বেদান্তের সাম্য ও স্বাধীনতার বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, এসকল ভেদ অবিদ্যার কাজ, খাঁটি মানুষ ইহার বশীভূত হইবে কেন? খাদ্যাখাদ্যের বিচার সম্বন্ধে গীতার বাণী উল্লেখ করিয়া তিনি বলিতেন—যাহার যাহাতে অভিরুচি এবং যাহা আয়ু, বল, আরোগ্য ও সুখস্মৃতি বর্দ্ধক তাহাই তাহার পক্ষে সাত্বিক আহার।

শ্যামাকান্তের জীবনে ভয় বলিয়া কোন জিনিষ ছিল না। সামাজিক ভয়, শাস্ত্রের ভয়, পরলোকের ভয়, মরণের ভয়,—কোন প্রকার ভয় কোন দিন তাঁহার জীবনে ঠাঁই পায় নাই। তিনি সংস্কার-মুক্ত পুরুষ ছিলেন। চিরকালই তিনি নির্ভীক ও পরোপকারী ছিলেন। তাঁহার হিংসাদ্বেষ বা রাগ মোটেই ছিল না। কিন্তু পরার্থে প্রয়োজন হইলে দক্ষিণ হস্তের সদ্‌ব্যবহারেও কুন্ঠিত হইতেন না।

তাঁহার কোন-কিছুর উপর কোন দিন বিন্দুমাত্রও আসক্তি ছিল না। বিশেষতঃ অর্থের ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। হাজার হাজার টাকা তিনি উপার্জ্জন করিতেন, কিন্তু টাকা পয়সা তিনি স্পর্শও করিতেন না।

মনের উপর আধিপত্য ও নির্ভীকতা ছোটকাল হইতেই তাঁহার জীবনের বৈশিষ্ট্য।

এই সমস্ত সাত্বিক গুণ তাঁহার জীবনে ছোটকাল হইতে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত স্বচ্ছধারায় বহমান রহিয়াছে। তাঁহার ভিতরকার মানুষটির এই প্রকৃত পরিচয় না পাইলে তাঁহার পরবর্ত্তী সন্ন্যাস জীবনটা ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠা যায় না। মনে হয় যেন উহা একটা খাপছাড়া অস্বাভাবিক ঘটনা। তাঁহার মনের গতি আজীবন সামঞ্জস্যের যে রেখাটি টানিয়া আসিয়াছে, যে যোগসূত্র তাঁহার গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস জীবনকে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছে, উহার সত্যকার পরিচয়টি জানিলেই তাঁহার জীবনের স্বরূপটি হৃদয়ঙ্গম হয়।

ছোটকাল হইতেই শ্যামাকান্ত স্বাধীনচিত্ত ও স্পষ্টবাদী ছিলেন। স্বাধীনচিন্তার ভাবপ্রবাহ তাঁহার শিরায় শিরায় আমরণ নাচিয়া বেড়াইত। তাই দেখি কর্ম্মজীবনেও তিনি গতানুগতিক পথে না চলিয়া একটা অসাধারণ কিছু করিলেন, ধর্ম্মজীবনেও শাস্ত্র ও লৌকিক অনুশাসন ও বিধি-নিষেধের গণ্ডী ভাঙিয়া একটা নূতন পথ আপনার স্বাধীনগতিতে দাগিয়া দিলেন। এমনতর স্বাধীনচেতাদের চরণ-গতিতে যেদিন জাতির চলতি পথটি রাঙা হইয়া উঠিবে, শুধু সেই দিনই সার্থক ও সফল হইবে, শ্যামাকান্তের জন্ম—তাঁহার কর্ম্ম ও সাধনা।

১৯১৮ সালের ৬ই ডিসেম্বর হিমালয়ের শান্তিময় স্নিগ্ধক্রোড়ে বাঙ্‌লাদেশের এই খাঁটি মানুষ সিংহপ্রতিম সন্ন্যাসী শ্যামাকান্ত নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন।



পরেশনাথ

পরেশনাথ

ঢাকা সহরের অপর তীরে বুড়ীগঙ্গা নদীর দক্ষিণ পারে শুভাঢ্যা গ্রামখানি অবস্থিত। এই গ্রামে ১২৬৩ সনের ফাল্গুন মাসে (ইং ১৮৫৬ সালে) পূর্ব্ব-বাঙ্‌লার বিখ্যাত মল্লবীর স্বর্গীয় পরেশনাথ ঘোষ মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। সাধারণের নিকট ইনি পার্শ্বনাথ নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। পরেশনাথের বাবার নাম ৺সীতানাথ ঘোষ এবং তাঁহার ঠাকুরদাদার নাম ৺নীলমণি ঘোষ। ইহারা সকলেই বেশ সুস্থ-সবল ও দীর্ঘজীবী ছিলেন।

শুভাঢ্যা গ্রামে একটি মধ্য-বাঙ্গালা স্কুল ছিল। এখানেই পরেশনাথের বাল্যশিক্ষার সূত্রপাত হয়। এই স্কুল হইতে চারি টাকা বৃত্তি পাইয়া তিনি ছাত্রবৃত্তি পাশ করেন এবং বাঙ্‌লা প্রবন্ধ রচনায় প্রথম স্থান লাভ করেন।

ছোট কাল হইতেই ব্যায়াম-চর্চ্চার দিকে তাঁহার খুব ঝোঁক ছিল। পনর বছর বয়সে তিনি গ্রামে একটি আখ্‌ড়া স্থাপন করিয়া সেখানে গ্রামের ছেলেদের লইয়া মহোৎসাহে কুস্তি-কসরৎ শুরু করিয়া দিলেন।

১২৭৮ সনে শুভাঢ্যা গ্রামেরই ৺অদ্বৈতচরণ দত্ত মহাশয়ের কন্যার সহিত পরেশনাথের বিবাহ হয়। তখন তাঁহার বয়স পনর কি ষোল বছর।

গ্রামের স্কুলে পড়া শেষ করিয়া পরেশনাথ ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে আসিয়া ভর্ত্তি হইলেন। এই সময়েই তাঁহার জীবনের গতি স্থির হইল এবং পরবর্ত্তী কালে শক্তিমত্তার জন্য তিনি যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন তাহার ভিত্তি পত্তন হইল। লক্ষ্মী-বাজারের স্বর্গীয় অধর ঘোষ তখন নাম-করা পালোয়ান। পরেশ নাথ এই সময় তাহার নিকট পরিচিত হইলেন। শ্যামাকান্তের সহিত এই সময়েই তাঁহার বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। পরেশনাথ আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত শ্যামাকান্ত, স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার গুহ ঠাকুরতা প্রমুখ বন্ধুদিগকে লইয়া কুস্তি ও ব্যায়ামাদি আরম্ভ করিয়া দিলেন। অধর ঘোষ নিজেও একজন ভাল কুস্তিগীর ছিলেন। তার উপর এই সমস্ত যুবকদিগের তরুণ উৎসাহ তাঁহাকে আকড়িয়া ধরিল। তিনি সযত্নে ও সস্নেহে ইঁহাদিগকে কুস্তি শিখাইতে লাগিলেন।

১২৮৩—৮৪ সালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল হইতে পরেশনাথ এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা দেন। এই সময়টায় ইঁহাদের মনে সৈনিক হওয়ার সাধ জাগে। পরীক্ষা দিয়া তিনি শ্যামাকান্তকে সঙ্গে লইয়া আড়া, গোয়ালিয়র প্রভৃতি স্থানে বেড়াইতে বাহির হইলেন। এই সময় অনেক স্থানে তাহারা ঐ দেশীয় পালোয়ানদের সাথে কুস্তি লড়েন এবং শারীরিক কসরৎ দেখান। গোয়ালিয়রের মহারাজার পালোয়ানের সহিত কুস্তিতে পরেশনাথ বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে গিয়াছিলেন

তাহা সফল হইল না। সৈনিক হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় জলাঞ্জলি দিয়া বন্ধুদ্বয় দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

পরেশনাথ কলিকাতা আসিয়া সিটি কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। তখনকার দিনে আই এ (এফ্-এ) তে অঙ্ক অবশ্য-পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে পরিগণিত ছিল। প্রত্যেক ছাত্রকেই অঙ্ক লইতে হইত। কিন্তু পরেশনাথ ইংরাজীতে বেশ পাকা হইলেও অঙ্কে ভয়ানক কাঁচা ছিলেন। আই-এ পরীক্ষায় অঙ্কে ফেল হইলেন। তারপর আরো দুইবার পরীক্ষা দিলেন, প্রত্যেক বারেই অঙ্কে ফেল হইলেন। তিনবার একই পরীক্ষায় ফেল হওয়াতে পরেশনাথের শ্বশুর মহাশয় পড়ার খরচ বন্ধ করিয়া দিলেন। পরেশনাথ দমিবার লোক ছিলেন না। তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায়-শক্তি ছিল। তিনি ছাত্র পড়াইয়া কলেজের পড়া চালাইতে লাগিলেন; এই সময়ে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রভাব তরুণ-দলে খুব বেশী। পরেশ-নাথও সে প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। ব্রাহ্ম-সমাজের সংস্পর্শে আসিয়া পরেশনাথ অনেক মহানুভব ব্যক্তির নিকট নানারূপ অর্থ সাহায্য পাইয়াছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে সিটি কলেজের প্রিন্সিপাল স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত এবং ডাঃ পি কে রায় অন্যতম। ইহাঁরা পরেশনাথকে খুব স্নেহ করিতেন ও উৎসাহ দিতেন এবং পরেশনাথও ইহাঁদিগকে অতিশয় ভক্তি করিতেন।

এইরূপে পাঁচ বৎসর চেষ্টার পর আই-এ পাশ করেন। আই-এ পাশ করিয়া ঢাকা কলেজে আসিয়া বি-এ পড়িতে ভর্ত্তি

হইলেন। ১২৯১ সালে অগ্রহায়ণ মাসে তিনি একবার খুব কঠিন পীড়াগ্রস্ত হন এবং অনেক দিন শয্যাগত থাকেন। পরেশনাথ পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিবার পর আর পড়া-শুনা করেন নাই।

ছোটকাল হইতেই নৈতিক চরিত্র ও ব্রহ্মচর্য্যের উপর পরেশ-নাথের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ছাত্রজীবনে ব্যায়াম-চর্চ্চাকালে কখনও ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ করেন না। এ বিষয়ে তাঁহার অন্তরের বন্ধু এবং প্রধান সহযোগী ও সহকর্ম্মী শ্যামাকান্ত তাঁহার আদর্শস্থানীয় ছিলেন। বিবাহিত জীবনের দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর অতিক্রম করিবার পর ১২৯০ সালে তাঁহার প্রথমা কন্যার জন্ম হয়।

পরেশনাথের শারীরিক শক্তির চরম উৎকর্ষের কাল ১২৭৮—১২৯০ সাল, এই বার বছর। এই সময় তাঁহার শরীর বিশাল ও সুষ্ঠু হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। শরীরটি ছিল সুগোল, বর্ণ অনুজ্জ্বল গৌর, শারীরিক সৌষ্ঠব অতুলনীয়। তাঁহার ওজন তখন ছিল তিন মণ চৌদ্দ পনর সের। সব চেয়ে যখন তাঁহার বেশী ওজন হইয়াছিল তখন চারি মণেরও উপরে গিয়াছিলেন।

একবার কলিকাতার ষ্টার থিয়েটার ঢাকায় আইসে। তখন ইংরাজি ১৮৮৪ কি ৮৫ সাল হইবে। সে সময়ে কলিকাতার নব্য সভ্যতা ও তদানুষঙ্গিক বিলাস-ব্যসন ঢাকাতে সম্পূর্ণ আমদানী হয় নাই। ঢাকা তখনও এ সকল বিষয়ে গোড়া। বিশেষতঃ পরেশনাথের মত নীতিপরায়ণ ব্যক্তিরা মেয়ে-থিয়েটার ইত্যাদি

সুশিক্ষা ও সংযমের পরিপন্থী বলিয়া মনে করিতেন এবং যুবকগণকে এই সকল সর্ব্বদা বর্জ্জন করিতে উপদেশ দিতেন। কাজেই এই প্রথম মেয়ে-থিয়েটারের আবির্ভাবে ভীষণ অন্দোলন উপস্থিত হইল। সকলেই প্রতিবাদ করিল—এইবার ছেলেদের সর্ব্বনাশ হইবে, থিয়েটার-টিয়েটার এখনই জ্বালাইয়া-পুড়াইয়া উঠাইয়া দাও। পরেশনাথ ঘোষণা করিলেন, খবরদার কেহ যেন থিয়েটার দেখিতে না যায়। থিয়েটার কোম্পানী বড়ই মুস্কিলে পড়িলেন, পরেশনাথ বিপক্ষে দাঁড়াইলে ঢাকায় এমন কোন ছেলে নাই যে থিয়েটার দেখিতে সাহস করিবে। তাহারা ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট আবেদন জানাইলেন, পরেশনাথ পিকেট করিলে আমরা আর থিয়েটার করিতে পারিনা, স্পেশ্যাল কনষ্টেবল নিযুক্ত করা হউক। তখন পরেশনাথকেও স্পেশ্যাল কনষ্টেবল করা হইল। কিন্তু ইহাতে আর এক মুস্কিল উপস্থিত হইল। এত বড় বিশাল শরীরে পুলিশের নির্দ্দিষ্ট মাপে তৈয়ারী পেটী লাগিবে কেন ? যত পেটী আনা হয় কোনটাই পরেশনাথের কোমরে লাগে না। অবশেষে কি করা ! অগত্যা মুচি ডাকিয়া আনিয়া পেটী বড় করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু পরেশনাথকে স্পেশ্যাল কনষ্টেবল পাইয়াও থিয়েটার কোম্পানীর বিশেষ সুবিধা হইল না। তাঁহার সেই সুবিশাল বরবপু দ্বারদেশে দণ্ডায়মান দেখিয়া কোন ছেলের আর সাহসে কুলাইত না যে তাঁহাকে এড়াইয়া যাইয়া থিয়েটার দেখে। কাজেই কিছুদিনের মধ্যে থিয়েটার কোম্পানীকে চাটি উঠাইয়া ঢাকা ছাড়িতে হইল।

পরেশনাথ

পরেশনাথ কলেজের পড়া শেষ করিয়া ১২৯১—৯২ সালে ঢাকা কিশোরীলাল জুবিলী স্কুলে শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলেন। মরণ পর্য্যন্ত তিনি এই স্কুলের মাষ্টারী করিয়া গিয়াছেন। স্কুলে তিনি ইংরেজী পড়াইতেন। পরেশনাথের আমলে যে সমস্ত ছেলের জুবিলী স্কুলে পড়িবার সুযোগ হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকেরই হৃদয়ে তাঁহার স্মৃতি একটা গভীর দাগ রাখিয়া গিয়াছে।

পরেশনাথ বড় অমায়িক ও সামাজিক লোক ছিলেন। তিনি হাস্যকর গল্প বলিয়া লোকেদের হাসাইয়া মারিতেন।

পরেশনাথ ক্লাশের ছেলেদের কাছে যে সকল মজার মজার রূপকথা ও হাসির গল্প বলিতেন তাহার দু-একটী নমুনা দিতেছি।

"একবার আমরা সুন্দরবনে শিকার করিতে যাই। সুন্দরবন এক আজব জায়গা। খালি বাঘ আর কুমীর—কেবল কিল্ বিল্ করিতেছে। ডাঙ্গায় বাঘ আর জলে কুমীর সে তো যেন আছে-ই। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্য এই যে সেখানে গাছের পাতাটী পড়া মাত্র—মাটিতে পড়িলে বাঘ হইয়া তাড়া করে আর জলে পড়িলে কুমীর হইয়া হাঁ করিয়া খাইতে আসে।"

ক্লাসে একটী দুষ্ট ছেলে ছিল। সে তখনি দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—স্যর, যে পাতাটী অর্দ্ধেক ডাঙ্গায় আর অর্দ্ধেক জলে পড়ে সেটা কি হয়?

ক্লাসে হো হো করিয়া একটা হাসির রোল পড়িয়া গেল। পরেশনাথও না হাসিয়া পারিলেন না।

"একবার আমরা বিক্রমপুরে শিকারে গেলাম। একদিন এক মাঠে মস্ত দুইটী বুনো মহিষ আমাদের তাড়া করিয়া আসে। মাঠের মধ্যে কোথাও একটু আশ্রয়ের ঠাঁই নাই। কি করি! নিকটেই একটা সরিষার ক্ষেত ছিল। তাড়াতাড়ি একটা সরিষার গাছে উঠিয়া বসিলাম। ভাবিলাম, বুঝি একটু নিরাপদ হইলাম। কিন্তু দেখিতে দেখিতে সেই ভীষণ মহিষ দুইটী আমার একেবারে কাছে আসিয়া হাজির হইল। তারপর আমাকে লাগাল না পাইয়া ভীষণ আক্রোশে সেই গাছটা মাথা দিয়া গুতাইতে শুরু করিল। সে আঘাতে গাছের সমস্ত পাকা সরিষা ঝর্ ঝর্ করিয়া ঝরিয়া পড়িল। তারপর সেই রাশি রাশি সরিষা উহাদের পায়ের ডলন-মলনে তেল হইয়া এক ভয়ানক স্রোতের সৃষ্টি করিল—আর সেই স্রোতে এই বিশাল জানোয়ার দুইটা তৃণের মত ভাসিয়া গেল। দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। তারপর তেলের স্রোত সরিয়া গেলে ধীরে ধীরে নামিয়া আসিলাম।"

সে সময়ে ঢাকা সহরে যত সব কুস্তিগীর পালোয়ান আসিয়াছেন সকলেই পরেশনাথের আতিথ্য ও আদরে আপ্যায়িত হইয়াছেন। ঢাকা সহরে আসিয়া পরেশনাথের আখ্ড়ার মাটি না মাখিয়াছে এমন পালোয়ান সেকালে ছিল না। তখন ঢাকায় যত কুস্তির প্রতিযোগিতা হইত সমস্তই পরেশনাথের পরিদর্শনে ও পরিচালনায় সম্পন্ন হইত। সকলেই পরেশনাথের বিচার মাথা পাতিয়া নিয়া খুসী হইয়া চলিয়া যাইত।

পরেশনাথের সন্তান-সন্ততির মধ্যে দুইটি মেয়ে মাত্র বর্ত্তমান। হারা উভয়েই বিবাহিতা। তাঁহার দুইটি ছেলেও হইয়াছিল, কিন্তু শৈশবেই মারা যায়। ১৮৯১ সালে পরেশনাথের পত্নীবিয়োগ ঘটে। সহধর্ম্মিণীর শোক তিনি খুব ধীরভাবে সহ্য করেন।

পরেশনাথ শেষ জীবন পর্য্যন্তও ব্যায়াম করিতেন। কিন্তু ব্যায়াম তাঁহার পক্ষে যথোপযুক্ত না হওয়াতে তাঁহার শরীর শেষ বয়সে অতিরিক্ত মোটা হইয়া পড়িয়াছিল। উহাতে তাঁহার চলিতে ফিরিতে বেশ কষ্ট বোধ হইত। শেষ বয়সে স্কুলে যাতায়াতের সময়েও দেখিয়াছি রাস্তায় বার তিনেক বিশ্রাম না করিয়া যাইতে পারিতেন না।

পরেশনাথ বীর ছিলেন, ক্ষত্রোচিত্র গুণ তাঁহার পূরামাত্রায়ই ছিল। অপমান তার ধাতে সইত না, দুর্ব্বলের উপর সবলের অত্যাচার দেখিতে পারিতেন না, রাগিলে তিনি রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিতেন। পরের আপদ বিপদে পরেশনাথ দৌড়িয়া আসিতেন, আপনার কাঁধ বাড়াইয়া অপরের বিপদ হাল্কা করিয়া নিতেন। ঢাকা সহরের নানা জনহিতকর অনুষ্ঠানেই তিনি আগুয়ান হইয়া গিয়াছেন। যতদিন পরেশনাথ ছিলেন ততদিন কাহাকেও কোন ঠেকা-বেঠেকায় ভাবিতে হয় নাই। তাঁহার জীবনের ছোট ছোট অনেক ঘটনায়ই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়।

১২৮৩ সালে পয়লা মাঘ পরেশনাথের নিজেদের জায়গায় চন্দ্রপাইকের মেলায় মেড়ার লড়াই লইয়া নমঃশূদ্র ও মুসলমানদের

মধ্যে খুব একটা মারামারি হয়। মুসলমানেরা বেজায় মার খাইয়া হঠিতে থাকে। সেই সময়ে পরেশনাথ শ্যামাকান্ত প্রভৃতি সহ উপস্থিত হইয়া নিজেরা অনেক মার সহ্য করিয়াও অনেক মুসলমানের প্রাণ বাঁচান।

পরেশনাথ তখন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে পড়িতেন। সেবার জন্মাষ্টমীর সময় তিনি অন্যান্য ছেলেদের সাথে তাঁহার স্কুলের সামনে মিছিল দেখিতে দাঁড়াইয়া গিয়াছেন। এই জায়গায় বরাবরই মিছিলের সময় খুব ভীড় হয়। সেবার একটি ছেলে বালক-সুলভ চপলতাবশতঃ মিছিলের হাতীর গায়ের ঝালরটা উচু করিয়া একটু দেখিতে চেষ্টা করিয়াছিল। ইহাতেই একটা পুলিশ ছেলেটার উপর রেগুলেশন লাঠি চালায়। অমনি পরেশনাথ, শ্যামাকান্ত, অধর ঘোষ সকলে দৌড়িয়া আসেন। তাহারা প্রতিবাদ করাতে পুলিশের সাথে ঝগড়া হয়। অনেক রিজার্ভ মিলিটারী পুলিশ ঘটনা-স্থলে আসিয়া উপস্থিত হয়। শুনা যায়, কোন পক্ষই পশ্চাৎপদ না হওয়াতে ব্যাপারটা নাকি বড়ই সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছিল।

পরেশনাথ যখন কলিকাতা সিটি কলেজে এফ্ এ পড়িতেন সেই সময়ে কোন কারণে সর্ব্বজনবরেণ্য দেশ-নায়ক স্বর্গীয় সুরেন্দ্র নাথের জেলের হুকুম হয়। ইহাতে ছাত্র সমাজ বিচলিত হইয়া উঠে এবং নানারূপ সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। সেই সময়ে কলিকাতা-বাসীরাও ঢাকার পরেশনাথের অনেকটা পরিচয় পাইয়াছিলেন।

৩—

একবার পরেশনাথ কলিকাতার এক জুতার দোকানে জুতা কিনিতে যান। এক জোড়া জুতা পছন্দ করিয়া দর জিজ্ঞাসা করেন। বিক্রেতার দর শুনিয়া পরেশ বাবু নিজেও একটা দর বলেন। উত্তরে লোকটী বলে—ও দামে একখানা জুতো নিতে পার। এই অপমানকর কথায় পরেশনাথ ভীষণ রাগিয়া যান। লোকটীও নরম না হইয়া আরো গরম হইয়া উঠে। তখন পরেশনাথ লোকটীকে হাতে-কলমে বেশ একটু ভদ্রতা শিক্ষা দেন। ফলে খুব একটা হৈ চৈ পড়িয়া যায়। স্থানীয় বহুলোক আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে। একক পরেশনাথ ক্রুদ্ধ জনতাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া বিজয়-গর্ব্বে ফিরিয়া আসেন।

পরেশনাথ ও শ্যামাকান্ত একবার রাজপুতনায় কসাইদের এক আখ্ড়ায় যাইয়া উপস্থিত হন এবং তাহাদের সহিত কুস্তি লড়িতে চাহেন। শ্যামাকান্ত একে একে সেই আখ্ড়ার সমস্ত সাক্রেদ ও তাহাদের ওস্তাদকে পরাস্ত করেন। শ্যামাকান্তের কুস্তির প্যাচ অপেক্ষা তাঁহার হাত দুইটীতে অসম্ভব রকম জোর ছিল। তিনি উহাদের এক একটার ঘাড়ে হাত দিয়া এমন ঘা মারিলেন যে, এক ঘা-তেই সে বসিয়া পড়িল। তার পর এক একটীকে ধরিয়া এক আছাড় মারেন আর চিৎ করেন। পরিশেষে ওস্তাদও যখন হারিয়া গেল তখন লোকগুলি একেবারে ক্ষেপিয়া পরেশনাথ ও শ্যামাকান্তকে মারিতে উঠিল। তখন তাঁহারা উহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া রাজপুতদের আর এক আখ্ড়ায় যাইয়া উপস্থিত

হইলেন এবং বেশ আদর-যত্ন পাইলেন। কসাইরা বাঙালী লড়্নেওয়ালা দেখিয়া প্রথমে অবজ্ঞা ও টিট্কারি দিয়াছিল। কিন্তু বাঙালীর এই শক্তির পরিচয়ে তাহাদের আস্পর্দ্ধা নষ্ট হইল।

পরেশনাথের জীবনের সাহসিকতার গল্প বলিয়া শেষ করা যায় না। ঢাকা সহরের অঙ্গে-অঙ্গে তাঁহার সাহসিকতার স্মৃতি মাখানো রহিয়াছে। তখনকার দিনে ঢাকা সহরের ভদ্রলোকের মান-সম্মান নিরাপদ ছিল না। গুণ্ডা-বদমায়েসদের জন্য সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকিতে হইত। শ্যামাকান্ত ও পরেশনাথই সর্ব্বপ্রথম ইহাদের যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ান এবং এইজন্য অনেক সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। শিক্ষিত ছেলেদের ভিতর তখন এমন একটা উৎসাহ আসিয়াছিল যে ডাঃ পি কে রায়ের মত লোকও অধর ঘোষের আখ্ড়ায় ল্যাঙট্ কষিয়া ডন-কুস্তি করিতেন। কিন্তু যাহাদের বাড়ীঘর ও মান-মর্য্যাদা রক্ষার জন্য ইঁহারা বুক বাঁধিয়া দাঁড়াইতেন, তথা-কথিত সেই ভদ্র সমাজেরই অনেকে আবার শ্যামাকান্ত-পরেশনাথকে 'যণ্ডা-গুণ্ডা' নামে অভিহিত করিতে ক্রুটী করিত না। হায় রে দুর্ভাগা দেশ!

দেশের সৌভাগ্য, সে ভাব আজ আর নাই। বাঙালী ঠেকিয়া ঠেকিয়া শিখিতেছে, শরীর-চর্চ্চা ও সাহসিকতা তাহার জীবনে কত বড় দরকার। ভগবান্ জাতির এই শুভবুদ্ধি অটুট রাখুন।

এই শক্তিমান্ পুরুষের জীবনে তেমন বড় কাজ করিবার

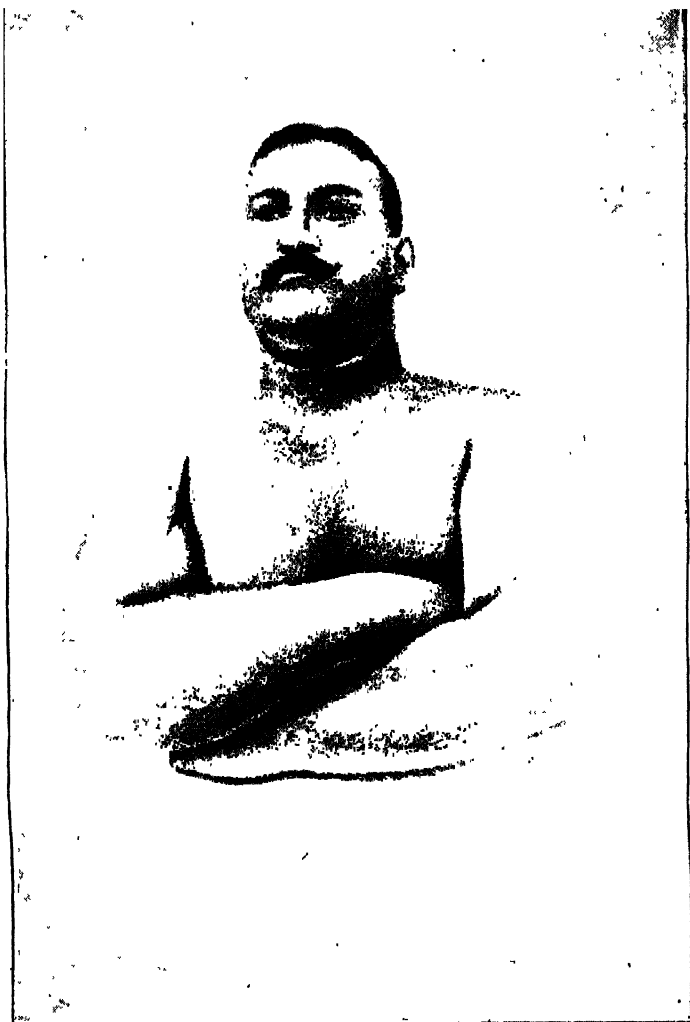
কোন সুযোগ ঘটে নাই। স্বাধীন দেশে জন্মিলে পরেশনাথ নিজের স্বাভাবিক ক্ষাত্র-প্রতিভায় সৈনিক বিভাগের এক উজ্জ্বল মুকুট-মণি হইয়া দেশ-মাতৃকার সেবায় কৃতকৃতার্থ হইতে পারিতেন। হয়ত যশস্বী সেনানায়কের বেশেই তাঁহাকে আমরা দেখিতে পাইতাম। স্বাধীন দেশের মাটি ও আবহাওয়ায় থাকিলে তাঁহাকে আজীবন মাষ্টারী করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে হইত না এবং উপযুক্ত অঙ্গচালনার অভাবে দুর্ব্বহ মাংসপিণ্ড বহন করিয়া জীবন-লীলা শেষ করিতে হইত না।

পরেশনাথ ১৯২৩ সালে আষাঢ় মাসের শেষ ভাগে ঢাকা সহরেই মারা যান। বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া তাঁহার দেহ নদীর পরপারে লইয়া যাওয়া হয় এবং তাঁহাদেরই নিজেদের জায়গায় তাঁহার নশ্বর দেহের শেষ কার্য্য নিষ্পন্ন করা হয়।

ঢাকা সহরকে কাঁদাইয়া ভাসাইয়া সে বীর-বপু অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়াছে, রহিয়াছে শুধু তাঁহার স্মৃতি ও প্রেরণা। জীবিত পরেশনাথ ছিলেন একক, আজ তিনি সহস্ররূপে বিরাজিত। এদেশের তরুণদল তাঁহারই ভাব-ধারার মূর্ত্ত বিগ্রহ। আজ অনেক স্থানেই শিক্ষিত ভদ্র সন্তানগণ আখ্ড়া গড়িয়া ব্যায়াম-চর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছেন। এক পরেশনাথকে হারাইয়া আমরা আজ বহু পরেশনাথকে পাইয়াছি। তরুণ পরেশনাথের দল তাহাদের জীবন-সাধনা দিয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া তুলুন, নারীর মর্য্যাদা রক্ষা করুন, ধর্ম্ম রক্ষা করুন।



ভীম ভবানী



ভীম ভবানী

ভীম ভবানী

কলিকাতার বিডন ষ্ট্রিটের সা-গণ বর্দ্ধিষ্ঠ গৃহস্থ ও বিশেষ পরিচিত। ইহাদের বংশের ৺উপেন্দ্রনাথ সাহা শক্তিমান্ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার নয় ছেলে, মধ্যমটি বিশ্ব-বিখ্যাত ব্যায়াম-বীর ও কুস্তিগীর ভীম ভবানী।

ভীম ভবানীর আসল নাম ভবেন্দ্রমোহন সাহা। বাঙ্‌লা ১২৯৮ সালে ভবানীর জন্ম হয়। ছোট কালে ভবানী বড় রোগা ছিলেন। চৌদ্দ পনর বছর পর্য্যন্ত ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া ভুগিয়া একেবারে শীর্ণকায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। ডি গুপ্ত খাইয়া যদি বা একবার কিছুটা আরোগ্য লাভ করেন, আবার জ্বর আসিয়া ভূতের মত ঘাড়ে চাপিয়া বসে। ভবানীর মনে না আছে শান্তি, না আছে লেখাপড়ার উদ্যম-উৎসাহ। শরীর সুস্থ না থাকিলে মনও ভাল থাকে না, সুস্থচিত্ত না হইলে লেখাপড়াও হয় না।

এই সময়ে একদিন একটি সামান্য ঘটনায় ভবানীর জীবনকে খ্যাতি ও গৌরবের পথে লইয়া গেল। একদিন তাঁহার সহিত তাঁহারই সমবয়স্ক একটি ছেলের কি কারণে ঝগড়া হয়। ঝগড়া হইতে ক্রমশঃ হাতাহাতি, মারামারি হইয়া যায়। ম্যালেরিয়া-রোগী ভবানী মারামারি আর কি করিবে ?—শুধু একহারা প্রহার খাইয়া দুর্জ্জয় অভিমান লইয়া বাড়ী ফিরিলেন। ইহাতে তাঁহার মনে বড়ই ধিক্কার আসিল। তিনি ভাবিলেন, যদি বাঁচিয়া

থাকিতেই হয় তবে মানুষের মত বাঁচিব। তখন হইতে তিনি শরীরের দিকে নজর দিলেন—শরীরকে শক্ত-সমর্থ করিতে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া গেলেন।

এই সময়ে দর্জ্জিপাড়ায় (কলিকাতা) ক্ষেতু গুহ মহাশয়ের বাড়ীতে মস্ত-বড় কুস্তির আখ্ড়া। ভারতবর্ষের নানাপ্রদেশ হইতে ক্ষেতুবাবুর আখড়ায় নামকরা পালোয়ানগণ কুস্তি লড়িতে আসিত। 'ক্ষেতুবাবুর আখড়ার মাটী না মাখিয়াছে এমন পালোয়ান তৎকালে ভারতবর্ষে ছিল না।' তখনও ক্ষেতুবাবু বাঁচিয়া আছেন। ভবানী ক্ষেতুবাবুর আখ্ড়ায় সাগ্রেদ (শিষ্য) হইয়া ভর্ত্তি হইলেন। এই আখ্ড়ায় বাঙালীর গৌরব জগৎ-জয়ী কুস্তিগীর গোবরবাবুও এই সময়ে কুস্তি শিখিতেন। ভবানী আখড়ায় ভর্ত্তি হইয়া প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে আসিয়া উৎসাহ ও উদ্যম সহকারে কুস্তি শিখিতে লাগিলেন।

শারীরিক শক্তিসঞ্চয় সাধনার বিষয়। তুচ্ছ বা অবহেলা করিলে এ সাধনায় সিদ্ধি লাভ হয় না। আমাদের ছেলেদের সব চেয়ে বড় দোষ, তাহারা বুল্ডগের মত আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকিতে পারে না। তাহাদের ইচ্ছা আছে, শক্তি আছে, বুদ্ধি আছে, সবই আছে, নাই শুধু বাঁচন-মরণ তুচ্ছ করিয়া জিনিষটাকে না ছোড়-বান্দার মত জড়াইয়া ধরিয়া থাকার ক্ষমতা। জাতীয় চরিত্রের এই দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ একবার দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমরা সঙ্কল্প করি ত আরম্ভ করিনা, আরম্ভ করি ত শেষ করিনা'।

শারীরিক ব্যায়াম-চর্চ্চা সম্বন্ধে কথাটা হাড়ে-হাড়ে সত্য। ছেলেরা দুইদিন ডন-কসরৎ করিয়া যদি শরীরের কোন ইতর-বিশেষ লক্ষ্য না করে তাহা হইলেই অমনি একেবারে হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া পড়ে, কার কসরৎ কে করে? যদি বা সৌভাগ্যক্রমে কাহারো শরীর একটু বাড়িতে থাকে, তবে তো কথাই নাই, অমনি শাস্ত্র-বাক্য আওড়াইয়া স্বল্প-সন্তুষ্ট আশুতোষ হইয়া পড়ে। এই দোষটা যেমন করিয়া হোক শোধ্‌রাইয়া নিতে হইবে, নহিলে শারীরিক শক্তি-সামর্থ্য লাভ ত দূরের কথা, শরীরটা শুধু ম্যালেরিয়া আর ডিস্পেপসিয়ার আস্তানা হইয়া পড়িবে। অভিমানী ভবানীর এই আঁকড়িয়া থাকার অভ্যাস ছিল বলিয়াই তিন চারি বৎসরের মধ্যে ম্যালেরিয়া-গ্রস্ত শীর্ণ শরীরটাকে তিনি এমন রূপান্তরিত করিয়াছিলেন যে প্রসিদ্ধ ব্যায়াম-বীর রামমূর্ত্তি পর্য্যন্ত ঊনিশ বছরের ছেলের এরূপ ভীমকান্তি দেখিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন। সেই কথাটাই বলিতেছি।

"ভবানীর যখন ১৯ বৎসর বয়স তখন সুপ্রসিদ্ধ রামমূর্ত্তি কলিকাতায় খেলা (সার্কাস) দেখাইতে আসেন। ভবানী খেলা দেখিতে গিয়াছেন। তাঁবুতে তিল ধারণের স্থান নাই, ভবানী হতাশ ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। হঠাৎ কাহার কর-স্পর্শে চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখেন, এক অপূর্ব্ব সুন্দর দিব্যকায় ব্যক্তি। তেমন বীরমূর্ত্তি ভবানী আর কোন দিন দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হইল না। আগন্তুক নির্ণিমেষ নেত্রে ভবানীর দিকে চাহিয়া-

ছিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত অতিবাহিত হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি খেলা দেখিতে আসিয়াছ ?" তাহাই উদ্দেশ্য শুনিয়া আগন্তুক ভবানীর হাত ধরিয়া সস্নেহে বলিলেন, "তুমি আমার সঙ্গে আইস ; আমি তোমাকে ভাল জায়গা দিতেছি।"

তাঁবুর মধ্যে যেখানে দলের লোকেরা বসিয়া-দাঁড়াইয়া ছিল, সেইখানে একখানা আসন দেখাইয়া দিয়া তিনি ভবানীকে বলিলেন, "বস"।

বীরকায় পুরুষ বিস্মিত নেত্রে ভবানীর অপূর্ব্ব অঙ্গ-সৌষ্ঠব লক্ষ্য করিতেছিলেন। তিনি ভবানীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,— "তোমার বয়স কত ?"

ভবানী বলিলেন,—"ঊনিশ।"

"এই বয়সে তোমার এমন শরীর ! আমি অনেক কুস্তিগীর পালোয়ান দেখিয়াছি। এমন অঙ্গ-সৌষ্ঠব, বীরোচিত অঙ্গ-গঠন ত দেখি নাই ! তোমার মত যুবক পাইলে আমার সর্ব্ববিদ্যা দিয়া পারদর্শী করিয়া তুলি।"

ভবানী তখনই জানিতে পারেন ইনিই সুবিখ্যাত প্রোফেসার রামমূর্ত্তি। ভবানীও রামমূর্ত্তির বীরপণা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন ; তাঁহার বীর-বপুর দিকে চাহিতে চাহিতে ভবানীর তরুণ হৃদয়ে যেন একটা তুফান বহিল। খেলা ভঙ্গে রামমূর্ত্তি আবার সস্নেহে ভবানীকে আহ্বান করিলেন ; আবার বলিলেন, "যদি তোমার মত যুবক পাইতাম—ইত্যাদি।"

ভবানী মাকে আর একথা বলিলেন না। বলিলে বিধবা জননী তো ছেলেকে এমন বিপদ-সঙ্কুল কাজে যাইতে দিবেন না। ভবানী রাতারাতি একদিন রামমূর্ত্তির দলের সহিত পলাইয়া একেবারে রেঙ্গুন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রেঙ্গুন হইতে সিঙ্গাপুর, যাভা প্রভৃতি স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

রামমূর্ত্তি যখন যবদ্বীপে তখন সেখানকার একজন ওলন্দাজ কুস্তিগীর তাঁহার সহিত কুস্তি লড়িতে চাহিলেন। রামমূর্ত্তি তো অস্বীকার করিতে পারেন না, কারণ তাহা হইলে নিজেরই অসম্মান। কেহ দঙ্গল বা প্রতিযোগিতায় কুস্তি লড়িতে চাহিলে কুস্তিগীর যিনি তাহাকে অন্ততঃ নিজের মান-মর্য্যাদার জন্যেও লড়িতে হয়। না লড়াই বড় নিন্দার কথা। রামমূর্ত্তি রাজী হইলেন। নিকটেই ভবানী ছিলেন, তিনি বলিলেন—ওস্তাদজী, আমি আপনার সাকৃরেদ। উনি আগে আমার সঙ্গে লড়ুন। তারপর তো আপনি আছেনই।

রামমূর্ত্তি খুসী হইয়া বলিলেন, "বহুত আচ্ছা বেটা,—লড়ো।"

তিন মিনিটে সাহেবের কুস্তির সাধ মিটিল। ভবানীর প্রথম প্রতিযোগিতাই সফল হইল।

কিন্তু রামমূর্ত্তির দলে ভবানীর বেশীদিন থাকা পোষাইল না। ভবানী বাড়ী ফিরিলেন।

ভবানী বসিয়া থাকিবার লোক ছিলেন না। প্রোফেসার কে বসাকের সার্কাস তখন নাম-করা। সমস্ত এসিয়াখণ্ডে ঘুরিয়া

বেড়াইতেছিলেন। ভবানী ইহাদের দলে গিয়া পড়িলেন। এখন হইতে ভবানী স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে খেলা দেখাইবার সুযোগ পাইয়া সকলকে বিস্মিত করিয়া তুলিলেন।

সাংহাইতে একজন আমেরিকান পালোয়ান ভবানীকে কুস্তিতে আহ্বান করে। বাজী ১,০০০ ডলার। লোকটা হারিয়া যায় এবং ১০০০ ডলার ঘাটতি দিয়া মুখ কালো করিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু লোকটা প্রতিশোধ লইবার জন্য ভবানীকে নিহত করিবার চেষ্টা করে। ভবানী স্থানীয় কনসালকে জানাইলেন। কনসালের চেষ্টায় ভবানীর জীবন রক্ষা হয়। কনসাল ভবানীর শক্তি-পরীক্ষার জন্য বলিলেন, আমি মোটর চালাইব, ভবানী যদি গাড়ী থামাইতে পারেন, গাড়ী তাহার। ভবানীর চেষ্টা সফল হইল, তিনি নূতন মিনার্ভা গাড়ীখানা পুরস্কার পাইলেন। ভবানী দুইখানা মোটর টানিয়া রাখিতে পারিতেন। একবার তিনখানাও রাখিয়াছিলেন। সে ঘটনা পরে বলিতেছি।

ভবানী ৫ মণ ওজনের বারবেল অল্প আয়াসেই ভাজিয়া দেখাইতেন। সিমেণ্টের পিপের উপর ৫।৭ জন লোক বসাইয়া পিপের ধার দাঁত দিয়া উঠাইয়া শূন্যে ঘুরাইতেন। বুকের উপর চল্লিশ মণ পাথর চাপাইয়া বিশ পঁচিশটি লোককে বসিয়া খেয়াল খাম্বাজ গাহিবার অবসর দিতেন। সর্ব্বশরীর লোহার শিকলে আবদ্ধ করিয়া পলকের মধ্যে মট্‌মট্‌ করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতেন। ভবানীর বুকের ও ঊরুর উপর দিয়া একই সময়ে দুইখানা গরুর

গাড়ী পঞ্চাশজন লোক লইয়া চলিয়া যাইত, ভবানী পাষাণ-মূর্ত্তির মত পড়িয়া থাকিতেন।

জাপান সম্রাট্ মিকাডো মহোদয় ভবানীর শক্তির পরিচয় পাইয়া একবার তাহাকে একখানি স্থবর্ণ পদক ও ৭৫০৲ টাকা পুরস্কার দেন।

এইরূপে সমগ্র প্রাচ্যখণ্ড বিজয় করিয়া বাঙালীর মুকুট-মণি ভবানী গৌরবোজ্জ্বল কিরীট পরিয়া দেশের মাটিতে পা দিলেন। চারিদিকে বঙ্গবীরের জয়ধ্বনি পড়িয়া গেল।

একবার ভরতপুরের মহারাজ ভবানীকে তিনখানা মোটর ধরিয়া থামাইতে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন, হাজার টাকা পুরস্কার দিবেন। ভবানী এ পর্য্যন্ত তুইখানা মোটরই থামাইয়া আসিয়াছেন, তিনখানা মোটর আবার কি ভাবে থামাইবেন। মহারাজ বলিয়াছেন,—এইবার বুঝিব বাঙালী কেমন বীর। ভবানী বলিলেন,—মহারাজ আয়োজন করুন। মহারাজ নিজে, রেসিডেণ্ট ও মন্ত্রী তিন জনে তিনখানা মোটর চাপিয়া বসিলেন। ভবানী গাড়ীগুলির পিছনে মোটা দড়ি বাঁধিয়া তুই হাতে তুইটি ধরিলেন, আর একটি কোমরে বাঁধিলেন। তারপর বলিলেন, Go—চালাও। তিন জনেই সমানে ষ্টার্ট দিলেন। স্পীডোমীটারে দেখা গেল এঞ্জিন পূরাদমে চলিতেছে, কিন্তু গাড়ী এক ইঞ্চিও নড়িল না। পিছনের চাকা শূন্যে উঠিয়া খর্‌র্ খর্‌র্ শব্দ করিতে লাগিল। মহারাজ গাড়ী হইতে নামিয়া বাঙালী বীর-যুবকের কর-মর্দ্দন করিলেন।

একবার মুর্শিদাবাদের নবাবের হাতীশালে একটা বুনো হাতী আনা হয়। হাতীটা লম্বায় ৯ ফুট সাত ইঞ্চি, ওজনও সাধারণ হাতীর চেয়ে রীতিমত বেশী। নবাব সাহেবের ইচ্ছা এই হাতীটা ভবানী বুকের উপর দিয়া চালাইয়া নিতে পারেন কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখেনা। হাতী বুকের উপর দিয়া চালাইয়া লইবার ক্ষমতায় ভবানীর গুরু রামমূর্ত্তি। রামমূর্ত্তিও পোষা সার্কাসের হাতী ছাড়া এ পর্য্যন্ত অন্য হাতী বুকের উপর লন নাই। ভবানীও এ পর্য্যন্ত অন্য হাতী লইবার চেস্টা করেন নাই। নবাব সাহেবের সন্তুষ্টি বিধানার্থ ভবানী জানাইলেন, তিনি বুকের উপর হাতী চালাইতে প্রস্তুত আছেন। সার্কাসের হাতী সাধারণতঃ অনাহার ও অর্দ্ধাহারে দুর্ব্বল ও শীর্ণ থাকে। কিন্তু এমন বন্য পশু বুকে তুলিবার দুরাশা কেউ কখনও করে নাই। ভবানী যখন সেই বন্য হাতীটাকে বুকের উপর চালাইয়া দিয়া অক্ষত ও সুস্থদেহে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তখন হাজার কণ্ঠে ভবানীর জয়ধ্বনি ও করতালি পড়িয়া গেল। বাঙ্‌লার লাটসাহেব নিজেও বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলেন।

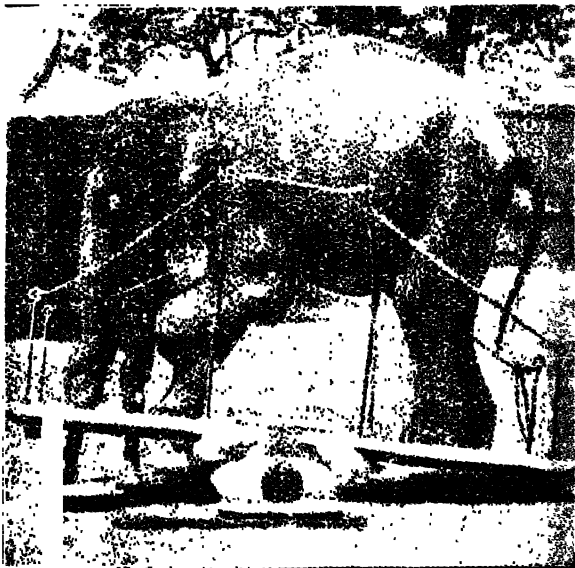
ভবানী ১২০ খানি স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক পাইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া শাল, আলোয়ান, আঙ্‌টি, মোটর গাড়ী, নগদ টাকাও যথেষ্ট পাইয়াছিলেন।

একবার কলিকাতা স্বদেশী মেলায় ভবানী তাহার অদ্ভুত ক্রীড়া দেখাইলেন। দেশের নেতৃস্থানীয় সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র,



ভীম ভবানী

(শিকল ছিঁড়িতেছেন)



ভীম ভবানী

হাতী বুকে লইে ন



গোবর

১৯ বৎসর বয়সে ২ মণ ওজনের

হাঁসলি গলায় প রিয়াছেন)

অমৃতলাল প্রভৃতি সকলেই সেই মেলায় উপস্থিত ছিলেন। ভবানীর খেলা দেখিয়া রসরাজ অমৃতলাল নাকি বলিয়াছিলেন, "মহাভারতের ভীম এমনি একজন বীর ছিলেন। তুমি দেখিতেছি কলিকালের ভীম। আজ হইতে আর তুমি শুধু ভবানী নহ, তুমি ভীম ভবানী।"

সেই হইতে ভবেন্দ্রনাথ ভীম-ভবানী নামেই পরিচিত হইলেন। পশ্চিমাঞ্চলে লোকে ভবানীকে ভীমমূর্ত্তি বলিত।

ভবানী ৩১ বছর বয়সে ১৩২৯সালে মারা যান। তিনি বিবাহ করেন নাই। নিজে খুব সাদাসিধা ভাবে চলিতেন, বাবুগিরি বিলাসিতা মোটেই তাঁহার ছিল না।

ভবানী মৃত্যুর পূর্ব্বে আগাসীর সার্কাসে সাপ্তাহিক দেড় শত টাকা বেতনে খেলা দেখাইতেন।

প্রাতে ২০০ শত বাদামের সরবৎ, এক ছটাক গাওয়া ঘি; মধ্যাহ্নে সাধারণ ভাত ডাল; অপরাহ্নে ২৲ বা ২॥০ টাকার ফল ও ৫০টি বাদামের সরবৎ ও এক সের মাংস; রাত্রে আধ সের আটার রুটি ও তিন পোয়া মাংস—ইহাই ছিল ভীম ভবানীর দৈনন্দিন আহার।

আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা এত অল্প বয়সে এমন বীর-যুবক হারাইলাম। বাঙ্‌লার তরুণ-দলই আমাদের আশা। ভীম-ভবানীর আদর্শ মাথায় লইয়া অগ্রসর হইতে হইলে তরুণ দলকেই সে কাজের ভার নিতে হইবে।

গোবর

যে ফাল্গুনী পূর্ণিমা বাঙ্‌লা দেশে মহাপ্রভুর আবির্ভাবে পবিত্র ও স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে সেই এক পুণ্য দিবসে আবার এই বাঙ্‌লা দেশেরই শ্যামল মাটিতে আর একজন বঙ্গমাতার সুসন্তান নূতনতর এক সাধনার বাণী লইয়া উপস্থিত হইলেন। ইংরাজী ১৮৯৪ সালের ১৩ই মার্চ্চ কলিকাতার মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীটে এক পালোয়ান-গোষ্ঠীতে বাঙ্‌লার ভবিষ্য দিগ্বিজয়ী কুস্তিগীর গোবর জন্মগ্রহণ করেন। গোবর জন্মের সময় এত মোটা ছিলেন যে ডাক্তারেরা বলিয়াছিলেন, ছেলে বাঁচিবে না।

গোবরের ভাল নাম শ্রীযতীন্দ্রচরণ গুহ। ইঁহারা আট পুরুষ যাবত কলিকাতায় বাস করিতেছেন এবং শিবু গুহের পরিবার বলিয়া বিখ্যাত। ইঁহাদের আদি নিবাস ছিল যশোহর এবং নিজেদের বঙ্গবীর মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বংশের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া থাকেন। বর্ত্তমান মস্‌জিদবাড়ী ষ্ট্রীটেই ইঁহাদের পুরাতন বাড়ীখানি অবস্থিত।

গোবরের কুস্তি-কৌশল তাঁহার বংশের অবদান। তাঁহার পিতামহ স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ গুহ মহাশয় অদ্বিতীয় কুস্তিগীর ছিলেন। ইনিই আমাদের বাঙালীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম সমস্ত ভারতবর্ষে কুস্তিতে নাম করেন। শুনা যায়, কুস্তিবিদ্যায় তাঁহার সমকক্ষ সেকালে ভারতবর্ষে কেহ ছিল না। অম্বুবাবু



গোবর

নিজে খুব নামকরা ধনী ছিলেন. কুস্তির চর্চ্চা ও উৎসাহের জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয়ও করিয়া গিয়াছেন। এই লক্ষপতি কুস্তিগীর কুস্তি শিক্ষার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা অকাতরে খরচ করিয়াছেন। তিনি সৌখীন ছিলেন, ব্যবসায় হিসাবে বা অর্থোপার্জ্জনের জন্য কুস্তি লড়িতেন না। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত বাঙলায় কতকগুলি কেন্দ্র স্থাপন করিয়া সমস্ত দেশময় এই ব্যায়াম-চর্চ্চাটা ছড়াইয়া দিয়া দুর্ব্বল বাঙালীকে সতেজ ও সজীব করিয়া তোলা। এই উদ্দেশ্যে তিনি সমস্ত টাকা-কড়ি ইত্যাদির বন্দোবস্ত করিয়া-ছিলেন,কিন্তু হঠাৎ মারা যাওয়াতে এ সঙ্কল্পটা আর কার্য্যে পরিণত করিয়া যাইতে পারেন নাই। সে আজ ২৯ বছর আগের কথা!

অম্বুবাবু মারা যাওয়ার পর তাঁহার পুত্র স্বর্গীয় ক্ষেত্রচরণ গুহ মহাশয় পিতার নাম ও যশ অর্জ্জনে সমর্থ হন, এবং ইনিও একজন ভারত-বিখ্যাত কুস্তিগীর হইয়া উঠেন। ক্ষেতুবাবু গোবরের জ্যেঠা মহাশয়। কলিকাতায় ক্ষেতুবাবুর আখড়া সমস্ত বাঙলা ও পশ্চিমাঞ্চলের নামজাদা পালোয়ানদের একটা বড় আড্ডা ছিল।

ক্ষেতুবাবু যখন মারা যান তখন গোবরের বয়স মোটে তের বছর। সে সময় এমন কেহ উপযুক্ত ছিল না যে এই বংশের অবদানটির মর্য্যাদা ও সম্মান রাখিতে পারে। দুই পুরুষের এই কুস্তির চর্চ্চাটা এক রকম উঠিয়া যাইবার যোগার হইয়া উঠে। তখন গোবরের বাবা শ্রীযুক্ত রামচরণ গুহ মহাশয় পুত্রকে ব্যায়াম-

চর্চ্চা করাইতে সুরু করিলেন। ইনিও যৌবনে কুস্তি করিতেন এবং এদিকে তাঁহারও অত্যন্ত ঝোঁক ছিল। এখন এই বৃদ্ধ বয়সে ল্যাঙট্ কষিয়া তিনি গোবরকে দাঁও-প্যাচ শিখাইতে আরম্ভ করিলেন। বড় বড় নামজাদা পালোয়ানদের দেখাইবার জন্য গোবরকে সঙ্গে লইয়া পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইলেন। গোবরের কুস্তি শেখার জন্য গামা, কাল্লু, রাহমানী প্রভৃতি নাম-করা পালোয়ানগণ নিযুক্ত ছিলেন। ইঁহারা প্রত্যহ প্রত্যেকে চারি টাকা হইতে ছয় টাকা বেতন পাইতেন।

রামচরণ বাবু পুত্রের জন্য যেমন একদিকে শরীর চর্চ্চার কার্য্যকরী ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তেমনি আবার পুত্রকে উৎসাহিত করিবার জন্য এবং উচ্চ ভাব প্রবাহ জীবনে চির বহমান রাখিবার জন্য সর্ব্বদা বলিতেন,—'বাঙালী যে দুর্ব্বল ইহা মিথ্যা। তোমার জীবন দিয়া একথা প্রমাণ করিয়া জোর গলায় বলিতে হইবে। ভগবান্ তোমাকে এমন একটা শরীর যখন নেহাৎই দিয়াছেন, ভাল করিয়া সাধনা কর। ফলাফল ভগবান্ জানেন, উহা তাঁরই হাতে।' আজ যে গোবরের দিগ্বিজয়ী বেশ দেখিয়া আমাদের বুক গর্ব্বে ফুলিয়া উঠে তাহার মূলে তাঁহার পিতার একান্ত উৎসাহ ও অর্থব্যয়। এখনও তিনি গোবরকে সর্ব্বদা স্মরণ করাইয়া দেন, তোমার দাদামহাশয়ের সঙ্কল্পের কথা যেন সব সময় তোমার স্মরণ থাকে। মনে রাখিও তাঁহার অতৃপ্ত আত্মার কাতর দৃষ্টি তোমার দিকেই চাহিয়া রহিয়াছে।

গোবর ছোটকালে বাড়ীতেই পড়িতেন। তারপর মেট্রোপলিটান স্কুলে (বর্ত্তমানে বিদ্যাসাগর স্কুল) ভর্ত্তি হন। এখান হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেন। তারপর কিছুকাল ইংলণ্ডে শিক্ষা লাভ করেন এবং আমেরিকা হইতে পত্র-ব্যবহারে (by correspondence) সমাজ-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান বিষয়ে পাঠ গ্রহণ করেন।

১৯১০ সালের মার্চ্চমাসে গোবর প্রথম য়ুরোপ যান। তখন তাঁহার বয়স সতর বছর মাত্র। তাঁহার সঙ্গে গামা-প্রভৃতিকেও লইয়া যান। এই সময়ে ইনি মাত্র তিন মাস বিদেশে থাকিয়া ভারতে ফিরিয়া আসেন।

বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিলেই গোবরের বিবাহ হয়। বর্ত্তমানে তাঁহার তিনটি ছেলে। ছেলেরাও বাপের কাছে বেশ কুস্তি-কসরৎ শিখিতে শুরু করিয়াছে।

১৯১২ সালে আবার গোবর য়ুরোপ যাত্রা করেন। এবারকার দিগ্বিজয়ের বিবরণ খানিকটা একখানি বিলাতী কাগজের তর্জ্জমা ("প্রবাসী") হইতে তুলিয়া দিলাম।

"Gobar the 18 stone Boy-Wrestler from India who wears a collar, 160lbs in weight—ভারতবর্ষের বালক-পালোয়ান গোবর—ওজন তিন মণ। সে গলায় দুই মণ ওজনের একটি হাসুলি পরে।

"হ্যাম্পষ্টেডে একটি বাড়ীর পেছনে একটা বাগানে আমি

গোবরকে প্রথম দেখি। ঘাসের উপর একটি মাদুর বিছান, তার উপর সেই অদ্ভুত বিশালকায় প্রায় তাঁরই মত প্রকাণ্ড ইংরাজ পালোয়ান ফিল লেনের সঙ্গে কুস্তি লড়্‌ছিল। ফিল খুব হাঁপাচ্ছিল, গোবরকে বেদম কর্‌তে খুব চেষ্টা কর্‌ছিল। কিন্তু গোবর কোনক্রমেই বেদম হচ্ছিল না।

"গোবর সবে মাত্র কুড়ি বৎসর অতিক্রম করেছে; কিন্তু কি ভীষণ যুবা! দৈত্যের মত তাঁর দেহ! সে একটা প্রকাণ্ড বালকের মত—চোখ উজ্জ্বল, বুদ্ধিদীপ্ত। জীবনটা তার কাছে আনন্দ ও সৌন্দর্য্যে ভরা, সে এখন বলবান্ এবং বলশালিতার গৌরব খুব অনুভব করে।

"গোবর বিলাতী খাদ্য ছোঁয় না। সব তার চাকররা রেঁধে দেয়। সে খুব পক্ষীমাংস ও মাখন খায়। তা ছাড়া বাদাম চিনি প্রভৃতি দিয়ে তৈরী এক রকম উপাদেয় জিনিষ (সরবৎ ?) তার ভারী প্রিয়। সে মদ স্পর্শও করে না। সিগারেট মাসে হয়ত এক আধবার টানে।

"তার দু' জোরা মুগুর আছে। এক জোড়ার প্রত্যেকটার ওজন পঁচিশ সের। আর এক জোড়ার প্রত্যেকটার ওজন এক মণ দশ সের।"

১৯১৩ সালের ২৭শে আগষ্ট তিনি স্কটলণ্ডবাসী ভারী ওজনদার পালোয়ান জিমি ক্যাম্বেলকে হারাইয়া Scottish Championship (স্কটীশ চ্যাম্পিয়ানশিপ) পান। ঐ বছরই



(১৯ বৎসর বয়সে ১মণ ১০ সের ওজনের এক একটি মুগুর ভাজিতেছেন)

৩রা সেপ্টেম্বর এডিনবরার ওলিম্পিক-অডিটোরিয়মে অজেয় জিমি এসেনকে (The Unconquerable Jimmy Essen) পরাজিত করিয়া Championship of the United Kingdom (চ্যাম্পিয়ানশিপ অব দি ইউনাইটেড কিংডম) লাভ করেন। ফরাসী-বীর মুষ্টিযুদ্ধ-নিপুণ কার্পেণ্টিয়ার ছাড়া এত অল্প বয়সে এ সম্মান আর কেহ পায় নাই। তারপর গোবর প্যারী যান। সেখানে য়ুরোপের অনেক বড় বড় পালোয়ানকে হঠাইয়া দেন। ইহাদের ভিতর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কুস্তি হয় জর্ম্মন দিগ্বিজয়ী কার্ল শাপ্টের সহিত (Karl Saft the German Champion)। সে কুস্তিটায় তিন ঘণ্টা পঁচিশ মিনিট কাল ধরিয়া লড়িতে হইয়াছিল। বিদেশের বিজয়-মালা গলায় পরিয়া ১৯১৫ সালে গোবর দেশজননীর কোলে ফিরিয়া আসিলেন।

১৯১৬ সালে জুলাই মাসে কোলাপুরের মহারাজার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পালোয়ান 'গণ্পু'র সহিত লড়িবার জন্য সেখানে যান; মহারাজ নিজেও একজন ভাল কুস্তিগীর ছিলেন। রীতিমত প্রত্যহ কুস্তি লড়িতেন। গোবর ও 'গণ্পু'র কুস্তি হইল পূরা দুই ঘণ্টা। কুস্তিটা সমান-সমান হইয়াছিল।

তারপর ১৯২০ সালের ভারতের বিখ্যাত পালোয়ান বড় গামার সহিত গোবরের কুস্তি ঠিক হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কুস্তির আট দিন আগে গোবর ডিপথেরিয়ায় মরণাপন্ন হইয়া পড়েন এবং সে কুস্তি বন্ধ হইয়া যায়।

এই সালেরই অক্টোবর মাসে গোবর তাহার উপযুক্ত শিষ্য বনমালীকে লইয়া মার্কিন দেশে যান। গোবর সেখানে সব নামজাদা পালোয়ানের সঙ্গে কুস্তি করিয়াছেন। ১৯২১ সালের ২৪শে আগষ্ট সান্ ফ্রান্সিস্কো সহরে অ্যাড্ স্যাণ্টেলকে (Add Santel) হারাইয়া Light Heavy-Weight Championship of the World লাভে জগৎখ্যাতি প্রাপ্ত হন। ইহা ছাড়া গোবর ষ্ট্রাংলার লুইস্ (Strangler Lewis), যুডিস্কো ব্রাদার্স (Zudisco Brothers), জো ষ্টেচার (Joe . Stechare) প্রমুখ মার্কিন মল্লবীরদের সাথেও কুস্তি লড়িয়াছেন।

এইরূপ ছয় বছর আমেরিকায় ঘুরিয়া ১৯২৬ সালের ডিসেম্বর মাসে গোবর ভারতে ফিরিলেন। তাঁহার ইচ্ছা দেশে থাকিয়া পিতামহের সঙ্কল্পটা কাজে পরিণত করা। ইনি বলেন—"আমার ইচ্ছা যাহাতে দেশের শিক্ষিত ভদ্রলোকের ভিতর ব্যায়াম-চর্চ্চা ঢুকে তাহার চেষ্টা করা। যাহাতে সুস্থ ও সবলদেহ ছেলেরা সমাজ ও দেশের কাজ করিতে পারে তাহারই যোগ্য করিয়া তোলা।,. এই মঙ্গলেচ্ছাকে শ্রী-সম্পন্ন ও সাফল্য-মণ্ডিত করিয়া তুলিবার আকাঙ্ক্ষাই তাঁর খুব বেশী। এই উদ্দেশ্যে তিনি একটী জাতীয় ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠার সংঙ্কল্প করিয়াছেন। তাঁহার এই শুভেচ্ছা সফল হোক্।

অনেকের ধারণা কুস্তি কসরৎ করিতে হইলেই পেশ্‌তা-বাদাম আর কালিয়া-কোর্ম্মা চাই, নচেৎ হিতে বিপরীত ঘটে। গোবর

কিন্তু ভাতের ভক্ত। তিনি বলেন—সাধারণ খাদ্যেই আমাদিগকে স্বাস্থ্যবান্ ও শক্তিমান্ করিয়া তুলিতে পারে যদি সংযমী হওয়া যায়, আর রীতিমত আমাদের দেশী ব্যায়ামগুলি সুষ্ঠুভাবে করা যায়।

যাহারা বাঙালীর দুর্ব্বল স্বাস্থ্যের জন্য বাঙ্‌লার জলবায়ুকে দোষ দেন তাহাদিগকে গোবরের এই কথাটি ভাল করিয়া মনে রাখিতে বলি,—"পৃথিবীর এত দেশ তো বেড়িয়ে এলুম, কিন্তু বাংলা দেশে আমার শরীর যেমন ভালো থাকে এমন আর কোথাও নয়।"

ইনি আরো বলেন—সাহেবেরা যেমন massage (মেসেজ্) করেন, আমাদেরও ডলন-মলন শরীর-চর্চ্চার জন্য বিশেষ আবশ্যক। উহাতে শরীরের খুব দ্রুত উন্নতি হয়।

ব্যায়ামের সময়সম্বন্ধে তিনি বলেন,সামর্থ্যই ইহার পরিমাপক। গোবর প্রথমতঃ মাত্র পাঁচ সাত মিনিট কুস্তি লড়িয়া হাঁফাইয়া পড়িতেন। তারপর ধীরে ধীরে দম বাড়াইয়া বাড়াইয়া পনর ষোল বছর বয়সে প্রত্যহ তিন চারি ঘণ্টা কুস্তি ও কসরৎ করিতেন। এখন তিনি সাধারণতঃ আড়াই ঘণ্টা কুস্তি ও কসরৎ করেন।

বর্ত্তমানে গোবর কলিকাতা নিজের ব্যায়ামাগারে শরীর চর্চ্চা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

গোবরের শরীরের ওজন ৩ মণ ২০সের (যখন আঠার বছর বয়স)।

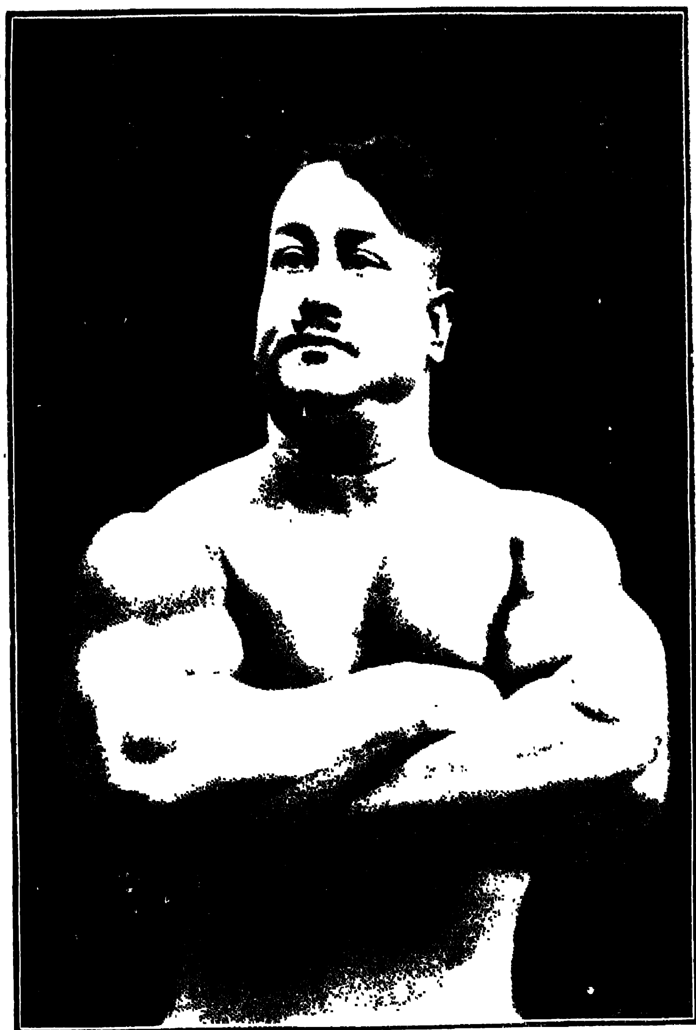
তাঁহার শরীরের পরিমাণ এইরূপ—

দৈর্ঘ্য ৬ ফিট্ ১ ইঞ্চি।

বুক ৪৮—৫০ ইঞ্চি, গলা ১৮॥০ ইঞ্চি।

কোমর ৪২ ইঞ্চি, জানু ৩০ ইঞ্চি।

স্বামী বিবেকানন্দ বিদেশে বাঙালীর ধর্ম্ম ও দর্শনের জয়ধ্বজা তুলিয়া ধরিয়াছেন, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বাঙালীর বৈজ্ঞানিক প্রতিভার পরিচয় দিয়া জগৎকে বিস্মিত করিয়াছেন, কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথ জগতের কবি-সভার বরমাল্য লাভ করিয়াছেন, আর গোবর শক্তি-সাধকগণের বৈঠকে বাঙালীর শক্তি-চর্চ্চার প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিয়াছেন। আমরা এই প্রতিষ্ঠার গর্ব্ব করি এবং বুক ফুলাইয়া জগতকে বলিতে পারি, বাঙালী শক্তি-চর্চ্চায় কারো পিছু নয়। গোবরের এই প্রতিষ্ঠা বাঙ্‌লার তরুণকে সমস্ত জীবনের সাধনা দিয়া বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে।



ফণীন্দ্রকৃষ্ণ

ফণীন্দ্রকৃষ্ণ

ফণীন্দ্রকৃষ্ণ একাধারে ডাক্তার ও ব্যায়াম-বীর। তাঁহার পূরো নাম কাপ্তেন ফণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত আই-এম্-এস্ (অবসর প্রাপ্ত)। কাপ্তেন খেতাবটি তাঁহার ডাক্তারির কৃতিত্বের নিদর্শন। ফণীন্দ্রকৃষ্ণই আমাদের দেশে সর্ব্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ব্যায়ামচর্চ্চা প্রচলন করেন এবং কেবল মাত্র ব্যায়াম-চর্চ্চা দ্বারা নানারূপ জটিল ব্যাধি আরোগ্য করিবার বিবিধ নূতন প্রণালী আবিষ্কার করেন।

১৮৮২ সালে কলিকাতা সহরে ফণীন্দ্রকৃষ্ণের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ৺ গোঁসাইদাস গুপ্ত। ইনি অতি ক্ষীণদেহ ও দুর্ব্বল ছিলেন। বাঙ্‌লার স্বনামখ্যাত কবি ৺ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় ফণীন্দ্রকৃষ্ণের মাতামহ ছিলেন।

হুগলী জেলার বালীতে ইঁহাদের পৈতৃক নিবাস ছিল। কিন্তু এক শত বছর যাবৎ কলিকাতা সহরেই বসবাস করিয়া আসিতেছেন।

কলিকাতায়ই ফণীন্দ্রকৃষ্ণের শিক্ষা আরম্ভ হয় এবং এখানেই তাঁহার শিক্ষার শেষ হয়। তিনি প্রথমে নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। স্কুলের পড়া শেষ করিয়া মেট্রোপলিটান কলেজে কিছুকাল পড়েন। তারপর সেখান হইতে আবার সেণ্ট্রাল কলেজে গিয়া ভর্ত্তি হইলেন। কলেজের সাধারণ শিক্ষা শেষ

করিয়া ইনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়িতে আরম্ভ করিলেন। ১৯০৮ সালে ডাক্তারি পরীক্ষায় পাশ হইয়া বাহির হন।

ছোটকালে ফণীন্দ্রকৃষ্ণ খুব রোগা ও দুর্ব্বল ছিলেন। সমবয়সীরা দেখিলেই ঠাট্টা করিত। কেহ বলিত,—ঐ ছাখ, ইঁদুর যায়। আবার কেহ তাঁহাকে বাঁধা দিয়া বলিত, ওরে ও ইঁদুর নয়, ও ফড়িং,—কি ফড়িং ভায়া, কেমন আছো ? এখন একটু উড়্‌তে পারো তো ?

ফণীন্দ্রকৃষ্ণ সঙ্কল্প করিলেন, যেমন করিয়া পারি ডন-কসরৎ করিব, এ বদনাম ঘুচাইব। তখন তাঁহার বয়স মোটে চৌদ্দ বছর। তিনি সোজা ৺ অম্বুবাবুর বাড়ী গিয়া হাজির হইলেন ; বলিলেন, আমাকে কুস্তি শিখাইতে হইবে। অম্বুবাবু তখনকার দিনে নাম-করা কুস্তিগীর। তাঁহার মস্ত অবস্থা— লাখ লাখ টাকা খরচ করেন শুধু কুস্তির পিছনে। এতটুকু ছেলের কথা শুনিয়া তাঁহার মমতা হইল। তিান এক গাল হাসিয়া বলিলেন, 'বেশ তো।' ফণীন্দ্রকৃষ্ণ অম্বুবাবুর আখ্‌ড়ায় ভর্ত্তি হইলেন। অম্বুবাবুর ও তাঁহার শিষ্যেরা সকলেই এতটুকু ছেলেকে খুব ভালবাসিতেন। ফণীন্দ্রকৃষ্ণ খুব মেধাবী ও পাঠানুরাগী ছিলেন, তাই অম্বুবাবুর বড় স্নেহের পাত্র হইতে পারিয়াছিলেন। অম্বুবাবু নিজে যত্ন করিয়া তাঁহাকে কুস্তি শিখাইতেন।

কুস্তি জিনিষটা বড় ক্ষুধার উদ্রেক করে, একেবারে রাক্ষসের

মত ক্ষুধা বাড়াইয়া দেয়। ফণীন্দ্রকৃষ্ণ সবে নূতন কুস্তি করিতেছেন, তাঁর ক্ষুধা যেন তাঁহাকে পাইয়া বসিল। তিনিও খুব খাওয়া স্বরু করিয়া দিলেন। সে অপর্য্যাপ্ত খাওয়া—লোকে দেখিয়া অবাক্ হইল। কিন্তু তাঁর শরীর হঠাৎ এ অত্যাচার সইবে কেন? তিনি শীঘ্রই ডিস্‌পেপসিয়ায় আক্রান্ত হইলেন। অনেক দিন এই রোগে কষ্ট পান। তারপর যখন ডাক্তারী ক্লাসে ভর্ত্তি হইলেন, তখন ডাক্তারী-শাস্ত্র আলোচনা করিয়া খাওয়াটা কমাইতে আরম্ভ করিলেন। তখন তাঁহার বয়স ঊনিশ বছর। এইরূপে আহার পরিমিত ও পরিবর্ত্তিত করিয়া তিনি এ রোগের হাত হইতে রক্ষা পান।

ফণীন্দ্রকৃষ্ণ সাত বছর অম্বুবাবুর আখড়ায় কুস্তি লড়েন। প্রত্যহ ভোরে কুস্তি লড়িতেন এবং বিকালবেলা ডাম্বেল প্রভৃতির ব্যায়ামাদি করিতেন। অম্বুবাবুর মৃত্যুর পর ফণীন্দ্রকৃষ্ণ নিজের বাড়ীর নিকটেই একটি আখড়া খোলেন। এখানে বাঙালী ও পশ্চিমদেশীয় যুবকদিগকে কুস্তি শিখাইতেন।

ফণীন্দ্রকৃষ্ণ মেডিক্যাল কলেজ হইতে ডাক্তারী পাশ করিয়া কলিকাতাতেই প্র্যাইভেট প্র্যাকটিস্ করেন। এই সময়ে তিনি কিছুকাল জাহাজের সার্জ্জন হইয়া চীন, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলণ্ড প্রভৃতি দেশ ঘুরিয়া আসেন। ১৯১৪ সালে যখন য়ুরোপের মহাসমর আরম্ভ হয় তখন তিনি ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসে ঢুকেন। এই সময়ে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ ও ডাঃ

সর্ব্বাধিকারীর চেষ্টায় বেঙ্গল এম্বুল্যান্স কোর নামক একটি বাঙালী স্বেচ্ছা-সেবক-দল যুদ্ধের জন্য গঠিত হয়; ইহার গঠন-কার্য্যে ফণীন্দ্রকৃষ্ণ যথেষ্ট সহায়তা করেন এবং ইঁহাদিগকে উপযুক্ত সামরিক শিক্ষা দিয়া ইহাদের সহকারী নায়ক (Adjutant) হইয়া মেসোপটেমিয়া যান। এই দলের সকলেই শিক্ষিত ও ভদ্র পরিবারের সন্তান। ইহারা ফণীন্দ্রকৃষ্ণের অধিনায়কতায় খুব সুখ্যাতির সহিত কাজ করেন। যখন এই দল ভাঙ্গিয়া যায় তখন ফণীন্দ্রকৃষ্ণ ঈজিপ্ট (মিশর), প্যালেষ্টাইন, তুর্কী, সিরিয়া, আর্ম্মেনিয়া, আফগানিস্থান প্রভৃতি স্থানে সৈন্যদলের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সুখ্যাতির সহিত কাজ করেন।

ভারতীয় সেনা-দলে কাজ করিবার সময় তিনি ভিন্ন ভিন্ন রেজিমেণ্টের নামজাদা পালোয়ানদিগকে কুস্তি শিখাইতেন। মাঝে মাঝে প্রধান সেনাপতির আদেশে কুস্তির প্রতিযোগিতায় বিচারক থাকিতেন।

প্রায় নয় বৎসর তিনি ভারতীয় মেডিক্যাল সার্ভিসে কাজ করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। এখন কলিকাতার মস্‌জিদ বাড়ী ষ্ট্রীটে বাড়ীতেই থাকেন। তাঁহার উদ্ভাবিত বৈজ্ঞানিক ব্যায়াম- প্রণালী শিক্ষা দিয়া বাঙ্‌লার দুর্ব্বল ও শ্রী-হীন তরুণদিগকে বলিষ্ঠ ও কর্ম্মিষ্ঠ করিয়া তুলিবার সাধনাই এখন তাঁহার জীবনের কাজ। তিনি ব্যায়াম-শিক্ষার ভিতর দিয়া চিকিৎসা করিয়া অনেক কঠিন রোগীরও আরোগ্য বিধান করিয়াছেন। তিন

বছর যাবত তিনি এইভাবে বাঙালী-ইংরাজ বহু রোগীকে রোগমুক্ত করিয়াছেন। অনেক কঠিন রোগে ডাঃ নীলরতন সরকার প্রমুখ কলিকাতার নাম-করা চিকিৎসকগণ ফণীন্দ্রকৃষ্ণের উদ্ভাবিত ব্যায়াম দ্বারা নিরাময় প্রণালীর ব্যবস্থা করেন এবং তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

কলিকাতায় যখন কুস্তির প্রতিযোগিতা হয়, অনেক সময় ফণীন্দ্রকৃষ্ণই বিচারক থাকেন এবং তাহার বিচার সকল পক্ষই মাথা পাতিয়া লন। গত ১৯২৩-২৪ সালের কলিকাতা প্রদর্শনীতে যে নিখিল-ভারত কুস্তির প্রতিযোগিতা (All India Championship Wrestling Tournament) হয়, তাহাতে ফণীন্দ্রকৃষ্ণ ও মুর্শিদাবাদের নবাব সাহেব মধ্যস্থ ছিলেন।

ফণীন্দ্রকৃষ্ণ একবার এদেশের নামজাদা পালোয়ান মন্নু খাঁর সহিত লড়িয়াছিলেন—অবশ্য সমান সমান হইয়াছিল ; যৌবনকালে মন্নু খাঁ নাকি বিখ্যাত গোলাম পালোয়ানের সমকক্ষ ছিলেন।

ফণীন্দ্রকৃষ্ণ দুই প্যাকেট খেলিবার তাস এক সঙ্গে একটানে ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারেন।

ইনি চব্বিশ বছরের সময় বিবাহ করেন। বর্ত্তমানে ইঁহার একটী পুত্র ও চারিটি কন্যা।

ফণীন্দ্রকৃষ্ণের শরীরের পরিমাণ এইরূপ ঃ—

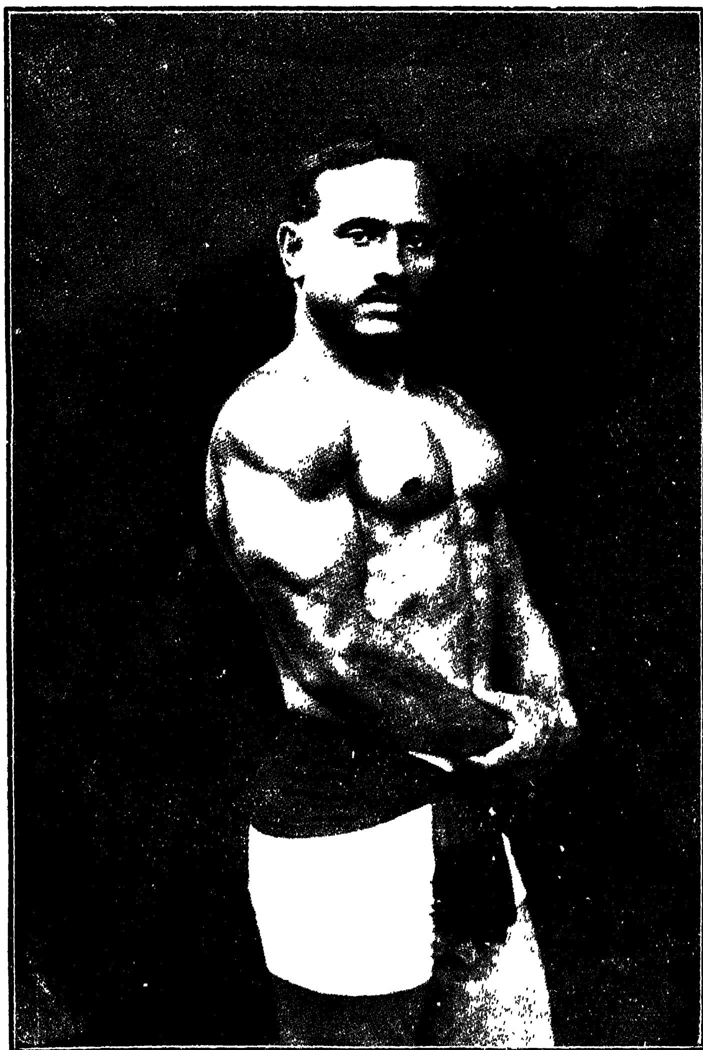
ওজন	২ মণ ১৫ সের
উচ্চতা	৫ ফিট্ ৫ ইঞ্চি

বুক	৪৭ ইঞ্চি (স্ফীত ৪৯½ ইঞ্চি)
বাহু (Bicep)	১৮ ইঞ্চি (৫ফিট ৫ ইঞ্চি উচ্চতায় ১৮ ইঞ্চি বাহু আর কাহারো নাই (World's record)
পুরোবাহু	১৪ ইঞ্চি
উরু	২৬½ ইঞ্চি
কোমর	৩৩ ইঞ্চি

ফণীন্দ্রকৃষ্ণ অতিরিক্ত আহারের বিরোধী। তিনি বলেন, প্রত্যেকের শরীরের প্রয়োজনমত আহারই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই Physiological Standard dietএর তিনি বিশেষ পক্ষপাতী। তিনি বলেন, সাধারণ বাঙালীর আহার ও নিয়মমত ব্যায়াম-চর্চ্চাই আমাদিগকে সুস্থ ও সবল করিবার পক্ষে যথেষ্ট।

ফণীন্দ্রকৃষ্ণ একদল সবল ও কর্ম্মঠ বাঙালী যুবক গড়িয়া তুলিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে শ্রীমান্ ব্রজবল্লভ পাল, শ্রীমান্ উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমান্ নারায়ণচন্দ্র দাস, শ্রীমান্ রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি নানাবিষয়ে কৃতিত্ব দেখাইয়া বাঙালীর দুর্ব্বলতার কালিমাটুকু মুছিয়া ফেলিতে সচেষ্ট আছেন। ভগবান ইহাঁদের দেশ-প্রীতি অটুট রাখুন।

বাঙালীর ঘরে ঘরে ফণীন্দ্রকৃষ্ণের মত এমনতর শক্ত-সমর্থ মানুষ হাজারে হাজারে গড়িয়া উঠুক। বাঙ্গালা মায়ের শীর্ণ মুখে সাফল্যের সবল হাসিটি ফুটিয়া উঠুক।



রাজেন ঠাকুরতা

রাজেন ঠাকুরতা

কলিকাতার সিটী কলেজ ও য়ুনিভারসিটি ল্ কলেজ হোষ্টেলের ব্যায়াম-শিক্ষক প্রোফেসার রাজেন্দ্রনারায়ণ গুহ ঠাকুরতার নাম আজ সুপরিচিত। একদিন রাজেন বড় ক্ষোভে ব্যায়াম-বীর রামমূর্ত্তিকে গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমার বাঙ্‌লা থেকে অন্ততঃ একশো রামমূর্ত্তি বের করে দেবো।" আজ তাঁহার সেই শপথ-বাণী সত্য হইতে চলিয়াছে। এমন ডজনখানেক রামমূর্ত্তি ইহারই মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে।

১২৯০ সালে মাঘ মাসে বরিশাল সহরে মামাবাড়ীতে রাজেনের জন্ম হয়। তাঁহার বাবার নাম ৺বসন্তকুমার গুহ ঠাকুরতা। ইঁহাদের বাড়ী বরিশাল জেলার বানরীপাড়া গ্রামে। রাজেনের বাবা খুব বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন।

রাজেনের বয়স যখন মোটে আড়াই বছর তখন তাঁহার মা বাপ উভয়েই সপ্তাহখানেকের ভিতর মারা যান। তখন হইতেই রাজেন মামাবাড়ীতে প্রতিপালিত।

ছোটকালে রাজেনের লিভার খারাপ ছিল, প্রায়ই অসুখে ভুগিতেন। একবার নিউমোনিয়ায় একেবারে মরার মত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

রাজেনের বয়স যখন মোটে ছয় বছর তখনই তিনি বেশ ঘোড়ায় চড়িতে পারিতেন। তের চৌদ্দ বছর পর্য্যন্ত তিনি

ঘোড়দৌড় অভ্যাস করেন। বার বছর বয়স হইতেই ডন-কস্‌রত করিতে আরম্ভ করেন। এইসময়ে তাঁহার খুব জেদ ছিল—রাগও ছিল ভয়ানক। যখন যাহা করিবেন বলিয়া ধরিয়া বসিতেন, তাহা নাছোর-বান্দা হইয়া ধরিয়া থাকিতেন, শেষ করিয়া তবে ছাড়িতেন। তাঁহার ডর-ভয় মোটেই ছিল না। একবার বাড়ীতে কি লইয়া রাগারাগি হয়, তিনি বাড়ী ছাড়িয়া পালাইলেন। তারপর এক সার্কাস-দলে গিয়া নাম লিখাইলেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র বার বছর এবং বরিশাল বি এম্ স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে পড়েন। তখন হইতেই তাঁহার পড়াশুনা ক্ষান্ত হয়।

এই সময় বরিশাল বি, এম্ স্কুলে ব্যায়াম-মাস্টার ছিলেন মল্লবীর ৺শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের যোগ্য শিষ্য সূর্য্যকান্ত গুহ ঠাকুরতা। সূর্য্যবাবু রাজেনকে বড় ভালবাসিতেন। তখন রাজেনের বয়স চৌদ্দ বছর। সূর্য্যবাবু রাজেনকে জোর করিয়া ব্যায়ামে প্রবৃত্ত করান। রাজেন সার্কাসের কসরত শিখিবার জন্য তাঁহাকে ধরিয়া বসেন। সূর্য্যবাবু যত্ন করিয়া তাঁহাকে জিমনাষ্টিকের সব রকম কৌশল (figure) শিখাইয়া দিলেন। রাজেনের শারীরিক গঠন স্বভাবতঃই বেশ ভাল ছিল। ব্যায়াম-চর্চ্চার ফলে তাঁহার শরীরটি দিন দিন বড়ই সুন্দর হইয়া উঠিল।

রাজেনের মামা কিন্তু ব্যায়াম-ট্যায়াম দুই চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। রাজেন যে ব্যায়াম করে ইহা বাসায় জানিতে পারিলে আর রক্ষা ছিলনা। বাধ্য হইয়া রাজেনকে লুকাইয়া-

পালাইয়া ব্যায়াম করিতে হইত। তিনি অনেক মারপিট খাইয়াও কোন দিন ব্যায়াম ছাড়েন নাই। এতখানি ঐকান্তিকতা ছিল বলিয়াই আজ তিনি এত বড় হইতে পারিয়াছেন। সৎকাজে বাঁধা বিপদ আছে জানিয়াই উহা আরো জোরে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে হইবে। বিপদের সাম্‌নে যে লক্ষ্য-চ্যুত হয় সে তো কাপুরুষ।

আগেই বলিয়াছি রাজেন ছোটকাল হইতেই ঘোড়-দৌড়ে অভ্যস্থ হইয়াছিলেন। তিনি দুষ্ট ঘোড়া সজুত করিতে খুব পটু ছিলেন। একবার একটা ঘোড়া কিছুতেই বাগ মানে না—আর ঘোড়াটাও ভয়ানক রকম তেজী। তখন রাজেন করিলেন কি, ঘোড়াটার চোখ বাঁধিয়া দিলেন। তারপর ঘোড়ার পিঠে বসিয়া খুব কষিয়া চাবুক মারিলেন। ঘোড়া একেবারে উর্দ্ধশ্বাসে তীরের মত ছুটিতে লাগিল। রাজেন উহার উপরে স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। ঘোড়া ছুটিতে ছুটিতে বহুদূর যাইয়া অবশেষে হয়রান হইয়া আপনিই বাধ্য হইয়া পড়িল।

সূর্য্যবাবুর নিকট তিন জন শিখ সৈন্য ডন-কস্‌রত করিতে যাইত। উহাদের মধ্যে একজন পাঁচ মণ ওজনের একটি পাথর বুকে লইয়া তাহার উপর আবার মানুষ উঠাইত। দেখিয়া রাজেনের তরুণ হৃদয়ের রক্তবিন্দুগুলি মাতিয়া নাচিয়া উঠিল। ভাবিলেন, শিখে যাহা করিতে পারে বাঙালীও তাহা অবশ্য পারিবে। তিনি সূর্য্যবাবুকে বলিলেন, আমি বুকে পাথর লইব। সূর্য্যবাবু তো

কিছুতেই দিবেন না। রাজেন কোন আপত্তিই শুনিলেন না। বাধ্য হইয়া সূর্য্যবাবু অনুমতি দিলেন। রাজেন পাঁচ মণ ওজনের পাথর খানি বুকে তুলিয়া সকলকে বিস্মিত করিলেন। এই সফলতায় তাঁহার আত্মশক্তিতে বিশ্বাস জন্মিল এবং মনের জোরও বাড়িয়া গেল। তিনি আরও ভারী পাথর উঠাইতে অভ্যাস করিতে লাগিলেন। এইরূপ চেষ্টা করিয়া তিনি কয়েক মাসের মধ্যেই নয় দশ মণ ওজনের পাথর বুকে লইতে সক্ষম হইলেন। তখন ১৯১০ সাল।

১৯১০ সালে বরিশাল সহরে দরবার দিন উপলক্ষে শারীর-চর্চ্চা লইয়া বি-এম্ কলেজ ও জিলা স্কুলের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা হয়। তখন বি-এম্ স্কুল ও কলেজ এক সঙ্গেই ছিল। দরবার দিনের পাঁচ সাত দিন পূর্ব্বে জিলা স্কুল সাত আট মণ ওজনের একখানা পাথর যোগার করে ও উহা দ্বারা কসরৎ দেখাইবার বন্দোবস্ত করে। রাজেন ভাবিলেন, জেলা স্কুলের চেয়ে বেশী কিছু একটা করা চাই-ই। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, সাত মণের বেশী একটা জিনিস বুকে চড়াইয়া জিলা স্কুলকে হঠান যায় কি করিয়া। দরবার দিনের চারি পাঁচ দিন পূর্ব্বে হঠাৎ তাঁহার নজর পড়িল, তাঁহাদের জিমনাষ্টিক ক্লাসের সামনেই আধ টন (১২৮০ মণ) ওজনের একটা রোলার (roller) পড়িয়া আছে। অমনি তাঁহার মাথায় খেয়াল চাপিল, রোলারটাই বুকে নিবেন। দৌড়িয়া তিনি সূর্য্যবাবুর নিকট গেলেন, বলিলেন, আমি রোলার বুকে

লইব। অনেক পীড়াপীড়িতে সূর্য্যবাবু রাজী হইলেন। দশ বার জন লোক রোলারটা তুলিয়া ধরিল—তিনি যাইয়া উহার নীচে শুইলেন। রোলার তাঁহার বুকের উপর চাপান হইল। তিনি অনায়াসে তাহা বুকে ধারণ করিলেন। পরের দিন রোলারের উপর আরো কয়েকজন লোক বসান হইল।

তারপর দরবার দিন আসিল। তিনি সে দিন সকলের সামনে বুকের উপর রোলার – তার উপর পাঁচ মণ ওজনের একখানি পাথর এবং তার উপর চারিজন লোক লইলেন। উপস্থিত দর্শকগণ বিস্ময়ে ও আতঙ্কে স্তব্ধ হইয়া রহিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব রাজেনের খুব প্রশংসা করিলেন।

ইহার পর হইতে রাজেনের মনের জোর খুব বাড়িয়া যায়। পর বৎসর দরবার দিনে তিনি একটন (২৭॥ মণ) ওজনের রোলার বুকে লন। প্রত্যেক বারেই বরিশাল কলেজের প্রিন্সিপাল মহোদয় তাঁহাকে মেডেল ও অন্যান্য পুরস্কার দিয়া উৎসাহিত করিতেন। বরিশালে তিনি পরিশেষে আড়াই টন (৬৮ মণ ৩০ সের) ওজনের রোলার বুকে লইতেন।

১৯১৪ সালে রাজেন একটি সখের সার্কাস দল (amateur circus party) গঠিত করেন। ১৯১৬ সালে তিনি ভজহরি দে নামক একজন সঙ্গীকে লইয়া ঢাকায় আর্মানীটোলা বায়স্কোপ হলে প্রথম টিকিট করিয়া সার্কাস দেখান। ইহাতে তিনি রোলার বুকে লন, শিকল ছিঁড়েন এবং ভজহরি ৪৫ মিনিট

মাটির নীচে থাকেন। ঐ বছর ঢাকাতেই ম্যাজিষ্ট্রেটের পত্নীর বিদায় উপলক্ষে তিনি মোটরগাড়ী থামান।

ছয় মাস ঢাকায় থাকিয়া মৈমনসিংহ মুক্তাগাছার রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য বাহাদুরের বাড়ীতে মোটর থামান এবং রোলার বুকে লন।

এই সময়ে রাজেন নারায়ণগঞ্জে সাড়ে তিন টন ওজনের একটি রোলার বুকে লইয়াছিলেন। ১৯১৭ সালে তিনি কলিকাতা যান। সেখানে কার্লেকার সার্কাসে তিনি চারি টন (১১০ মণ) ওজনের রোলার বুকে লন।

ইহার পর বৎসর তিনি অলডার্স সার্কাসে হাতী লওয়া অভ্যাস করেন। ১৯১৯ সালে চট্টগ্রাম জেলার ধূম গ্রামে রায় বাহাদুর গোলোকচন্দ্রের বাড়ীতে একটা হাতীকে এক দিনের ভিতর শিক্ষিত করিয়া সেটাকে বুকে লন।

১৯১৯ সালে প্রোফেসর রামমূর্ত্তি খেলা দেখাইতে বরিশাল যান। রাজেন সেই সময় তাঁহার নিকট প্রস্তাব করেন যে রামমূর্ত্তির সবগুলি খেলাই তিনি দেখাইবেন। রামমূর্ত্তি রাজী হন এবং রাজেনকে তাহার খেলার জিনিষ পত্র দিবেন বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু দুই তিন দিন পরে তিনি রাজেনকে তাহার জিনিষপত্র (instruments) দিতে নারাজ হন। ইহাতে রাজেন খুব চটিয়া যান এবং তাঁহাকে সগর্ব্বে বলিয়া দিলেন, তিনি জীবনে অন্ততঃ একশত রামমূর্ত্তি গড়িয়া যাইবেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পর রাজেন একটি গরুর গাড়ী বুকে লইবার সময় হঠাৎ তাঁহার বুকে একটা আঘাত পান এবং কিছুদিন বিশ্রাম লইবার জন্য কলিকাতা যান।

একদিন কলিকাতায় সিটি কলেজের অধ্যাপক ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চাটার্জ্জির সহিত তাঁহার দেখা হয়। সতীশবাবু পূর্ব্বে বরিশাল কলেজে প্রোফেসার ছিলেন এবং তখন হইতেই রাজেনের সহিত তাঁহার পরিচয়। সতীশবাবু রাজেনকে পাইয়া বলিলেন, রাজেন, তোমাকে সিটি কলেজের ব্যায়াম-শিক্ষক (Physical Instructor) হইতে হইবে। রাজেনের ছোটকাল হইতে চাকুরী করার ইচ্ছা ছিলনা, কিন্তু সতীশবাবু বলিলেন,—রাজেন, শুধু নিজের শরীর বড় করিলেই চলিবে না, সঙ্গে সঙ্গে আরো দশজনের শরীরও ভাল করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। বাঙালী শরীর হিসাবে বড় দুর্ব্বল। বাঙালীকে সবল করিয়া তুলিবার ভার তোমাদিগকেই নিতে হইবে। তখন তাঁহার মনে হইল রামমূর্ত্তির কাছে তাঁহার প্রতিজ্ঞার কথা। ভাবিলেন, এই তো সুযোগ। স্কুল কলেজের ভিতর দিয়াই তো বাঙালীকে সবল করিবার মন্ত্র প্রচার করিতে হইবে।

১৯২০ সালের জুলাই মাসে তিনি চাকুরী গ্রহণ করিলেন। এই বছর সেপ্টেম্বর মাসেই তিনি কলিকাতায় শরীর-চর্চ্চা প্রদর্শন করেন। এই উপলক্ষে তিনি মোটর থামান, রোলার বুকে লন এবং বারের (Bar) নানারকম কসরৎ দেখান।

রাজেন ইহারই মধ্যে একদল শক্তিশালী তরুণের সৃষ্টি করিয়াছেন, ইঁহারা দেশের গৌরবস্বরূপ। তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে শ্রীমান্ গোপালচন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী তিনখানা মোটর থামাইতে পারেন। শ্রীমান্ শৈলেন্দ্রনাথ চৌধুরী তুইটন রোলার বুকে লন, শ্রীমান্ বিষ্টুচরণ ঘোষ muscle controlএ (মাংসপেশীর স্বেচ্ছানুরূপ সঞ্চালন) পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, শ্রীমান্ হীরেন্দ্র নাথ দত্ত motor accidentএ (দূর হইতে force দিয়া মোটর খানিকে গায়ের উপর দিয়া চালাইয়া লইতে দেওয়া) এবং motor brushingএ (তুই ধারে তুই খানি মোটর push করিয়া ঠেলিয়া দেওয়া) খুব কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, শ্রীমান্ শৈলেন্দ্র চৌধুরী, শ্রীমান্ গোপাল চৌধুরী, শ্রীমান্ জ্যোতিরিন্দ্র রায়, শ্রীমান্ সত্যপদ ভট্টাচার্য্য weight-lifting এ (ভার-উত্তোলন) এবং শ্রীমান্ কেশবচন্দ্রসেন muscle confrol ও bar-bendingএ (লৌহদণ্ড ধনুকের ন্যায় নত করা) বিশেষ উন্নতি করিয়াছেন। আশা করি ইহাদের প্রত্যেকেই নিজেদের নিঃস্বার্থ জীবনের সাধনা দিয়া তুর্ব্বল ও স্বাস্থ্যহীন তরুণ বাঙলাকে সুস্থ ও সবল করিয়া তুলিবেন।

ছোটকাল হইতেই রাজেন নানারকম আজগুবি চিন্তা করিতেন। কেমন করিয়া সূর্য্যে যাওয়া যায়, পৃথিবীতে যখন কেহ ছিল না তখন ইহার অবস্থা কেমন ছিল—এই সব ছিল তাঁহার চিন্তার বিষয়। বস্তুতঃ তাঁহার স্বাধীন চিন্তা ও ইচ্ছা-শক্তি (will power) স্বভাবতই খুব প্রবল ছিল।

রাজেন কলিকাতায় একটা নূতন উদ্যম ও প্রেরণা সৃষ্টি করিয়াছেন। বাঙালীকে শরীরের দিক্ দিয়া সবল ও সমর্থ করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য তিনি "All Bengal Physical culture Association" নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। দেশের গণ্যমান্য অনেকেই ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট এবং যাঁহারা শরীরচর্চ্চায় বাঙলায় অগ্রণী সেই গোবরবাবু, কাপ্তেন ফণীন্দ্রকৃষ্ণ, পুলিনবাবু প্রভৃতি ইহার সভ্যশ্রেণীভুক্ত রহিয়াছেন। রাজেনের এই সঙ্কল্প মূর্ত্ত হইয়া উঠুক।

রাজেন ১৯২৫ সাল হইতে কলিকাতার "ল্" কলেজের ছাত্রাবাস হার্ডিঞ্জ হোষ্টেলের ব্যায়াম-শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন এবং তাঁহারই উদ্যোগে সেখানে একটি চমৎকার ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রাজেন এখন হার্ডিঞ্জ হোষ্টেলেই থাকেন।

রাজেনের বয়স যখন পনর কি ষোল, তখনই তাঁহাকে একরকম জোর করিয়া বিবাহ করান হয়। ইহার পূর্ব্বে অনেকবার তিনি বিবাহের প্রস্তাবে বাড়ী হইতে পালাইয়া গিয়াছেন।

রাজেন নিরামিষাশী। মাছ মাংস তিনি বিশেষ পছন্দ করেন না। তিনি বলেন নিরামিষ আহারেই শরীর ভাল থাকে, অসুখ-বিসুখও কম হয়। খাওয়ার বিষয়ে তিনি বিশেষ সংযমী—খুব অল্প আহার করেন। তিনি বলেন, সাধারণ বাঙালীর যা খাদ্য তাহাতেই শরীর বেশ ভাল হইতে পারে। পেস্তা-বাদাম মাংস-পোলাওর কোন দরকার পড়ে না। তিনি পোষা-শরীর—যে

শরীর সবল ও সুন্দর করিয়া তৈরী হয় শুধু লোক দেখানোর জন্য,—সে শরীর মোটেই পছন্দ করেন না। শরীর যদি সৎকাজেই না লাগিল সে শরীর থাকা না থাকায় কোন তফাৎ নাই। তিনি অনেক দিন হইতেই ছাত্রদের সহিত মিশিতেছেন, ছাত্রদের ভাল মন্দ কিসে হয় তিনি তাহা ভাল করিয়াই বোঝেন। তিনি বলেন— যে কোন ব্যায়াম নিয়মিত ভাবে করিতে পারিলেই শরীর ভাল হয়। সংযম-শিক্ষা ও ব্যায়াম-চর্চ্চা পরস্পর একটি আর একটির উপর নির্ভর করে। শরীর-চর্চ্চাটা হঠযোগেরই একটা অংশ। ইহাও সাধনার মত করিয়াই করিতে হয়।



মহেন্দ্রনাথ

সার্কাস-বিখ্যাত মহেন্দ্রনাথের নাম বাঙালী ছেলে-বুড়া সকলের নিকটই পরিচিত। মহেন্দ্রনাথ নিজের জীবন-সাধনা দিয়া বাঙ্‌লা দেশে একটা নূতন উদ্যম ও অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করিয়াছেন।

১২৮৫ সালে ২রা জ্যৈষ্ঠ ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত নয়নাগ্রামে মহেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূরা নাম শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ দাশ মজুমদার। মহেন্দ্রনাথের বাবার নাম ৺ভগবানচন্দ্র দাশ মজুমদার। ছোটকালে মহেন্দ্রনাথ বিক্রম পুরের অন্তর্গত বজ্রযোগিনী গ্রামে উচ্চ ইংরাজী স্কুলে পড়িতেন। যখন তিনি চতুর্থ শ্রেণীতে পড়েন সেই সময়ে তাঁহার বাবা মারা যান। পিতার মৃত্যুর পর অর্থাভাবে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া পড়াশুনায় ক্ষান্ত হইতে হয়। তখন তিনি চাকুরীর জন্য চেষ্টা করিতে থাকেন এবং কিছুকাল ফৌজদারী আদালতে নকল-নবিশের কাজ করেন। কিন্তু তিনি অন্য ধাতের মানুষ ছিলেন। কলম পেষা তাঁহার পোষাইল না। তিনি রঙ্গপুরে গেলেন—অন্য কোন কাজ পান কিনা। কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও কোথাও দশ পনর টাকার চাকুরীও মিলিল না।

তখন তিনি ব্যায়াম-চর্চ্চায় মন দিলেন—নানা জায়গায় ঘুরিয়া ব্যায়াম শিখিলেন। কিছুদিন ব্যায়ামের মাষ্টারিও করিলেন।

ইহার পর তিনি সুবিখ্যাত এরেল্ সাহেবের গ্রেট্ ইষ্টার্ণ সার্কাসে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তাঁহার আত্মনির্ভরশীল স্বাধীন-চিত্তটি বেশী দিন পরের আনুগত্য স্বীকার করিয়া থাকিতে চাহিল না। কিছুদিন এই সার্কাসে কাজ করিবার পর তিনি নিজেই একটি ক্ষুদ্র সার্কাস দল খুলিয়া নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ইহাই তাঁহার অধুনা-বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল সার্কাসের বাল্যাবস্থা।

যে মহেন্দ্রনাথ একদিন আট দশ টাকার চাকুরীর জন্য মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ফিরিয়াছেন আজ তিনি স্বাবলম্বন ও অধ্যবসায় বলে প্রচুর অর্থ, সম্মান, খ্যাতি সকলই পাইয়াছেন এবং কত কত স্বর্ণ পদকাদিতে শোভিত হইয়া জাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন।

একদিন স্বর্গীয় পরেশনাথের সঙ্গে প্রোঃ রামমূর্ত্তি দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। কথায় কথায় রামমূর্ত্তি একটু টিটকারী করিয়া বলিয়াছিলেন—বাঙলা দেশে কিছুই নাই। শরীর চর্চ্চার নূতন কিছু দেখানো বাঙালী বাবুর কাজ নয়। কথায় বলে—'সাজা বাজা কেশ, তিন বাংলা দেশ।' জাতির প্রতি ব্যঙ্গোক্তিতে অভিমানী পরেশনাথের শরীর জ্বলিয়া গেল। তিনি মহেন্দ্রনাথকে ডাকিয়া প্রোঃ রামমূর্ত্তির কথা শুনাইয়া বলিলেন,—মহেন্দ্র, একটা নূতন কিছু খেল দেখি, যাতে বাঙালীর মানটা বজায় থাকে।

মহেন্দ্রনাথ, পরেশনাথের আখড়ার মাটি গায়ে মাখিয়াছেন।



ব্যায়াম-বীর মহেন্দ্রনাথ



মহেন্দ্রনাথ

তিনি পরেশনাথকে খুব শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। তিনি সংকল্প করিলেন, একটা নূতন কিছু করিবেনই। রামমূর্ত্তি তখন বুকে হাতী লইতেন। একদিন মহেন্দ্রনাথ রাস্তা দিয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে একটী বিপুলাকার লোহার রোলার তাঁহার নজরে পড়িল। অমনি তাঁহার খেয়াল চাপিল,—১৬২ মণ ওজনের এই লোহার রোলারটি বুকে তুলিয়া লইবেন। যেমনি সঙ্কল্প তেমনি কাজ। সেই রাত্রেই কয়েকজন সহকর্ম্মীর সাহায্যে এই রোলারটা বুকে লইলেন এবং দিন কয়েকের মধ্যেই খেলা দেখাইয়া সকলকে বিস্মিত ও স্তম্ভিত করিয়া দিলেন।

মহেন্দ্রনাথের অন্যান্য খেলায়ও তাঁহার অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বুকের উপর বিশ মণ ওজনের একখানি পাথর তুলিয়া লন। সেই পাথর খানির উপরে একটি দণ্ডের মাথায় "রাধাচক্রে" ৪।৫ জন লোক কয়েক মিনিট ঘুরিতে থাকে। তারপর রাধাচক্রটি নামাইয়া লইলে তিনি নিজেই সেই পাথরখানি ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া উঠেন।

মহেন্দ্রনাথ ভার-উত্তোলনেও অদ্বিতীয়। তিনি কতকগুলি লোহার গোলা লইয়া এই খেলা দেখান। এক মণ ওজনের একটি গোলা তিনি অনায়াসে চিবুকের উপর রাখিতে পারেন এবং যে কোন হাতে এই গোলাটি দশ বার হাত দূরে এবং চারি পাঁচ হাত ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিতে পারেন। পাঁচ মণ ওজনের গোলা দুই হাতে ধরিয়া শূন্যে তুলিয়া রাখিতে পারেন এবং মাথার

উপর দিয়া চারি পাঁচ হাত দূরে পশ্চাৎদিকে নিক্ষেপ করিতে পারেন।

মহেন্দ্রনাথের আর একটি খেলা মোটর টানিয়া রাখা ; তিনি একযোগে পঁচিশ অশ্বশক্তির সমতুল্য দুইখানি মোটর টানিয়া রাখিতে পারেন, একখানার তো কথাই নাই। মোটর গাড়ী দুইখানা মোটা দড়ি দিয়া তাঁহার দুইহাতের সহিত বাঁধিয়া দেওয়া হয়। তাঁহার পর তিনি ঠিকমত দাঁড়াইলেই মোটর দুইখানা দুইদিকে পূর্ণবেগে চালাইয়া দেওয়া হয়। মহেন্দ্রনাথের বাহুবলের নিকট মোটরের গতিবেগ একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। 'মোটর জাম্প' (Motor Jump) মহেন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ নূতন খেলা। একখানি চলন্ত মোটর লইয়া অবলীলাক্রমে ২৫ ফিট হইতে ৪০ ফিট (দৈর্ঘ্যে) জায়গা ১৫ ফিট হইতে ২১ ফিট উচ্চে লাফ দিয়া পার হইয়া যান। ইহা তাঁহার অসামান্য সাহস ও ক্ষিপ্রতার যথেষ্ট পরিচয়। বস্তুতঃ এরূপ অমানুষিক ক্রীড়া এ পর্য্যন্ত জগতে আর কেহ খেলেন নাই।

ধনুর্ব্বিদ্যায় মহেন্দ্রনাথ এ যুগের সব্যসাচী। তাঁহার 'শব্দভেদীবাণ' 'সপ্ততালভেদ' প্রভৃতি খেলা আমাদিগকে বিস্ময়ে আপ্লুত করিয়া দিত। এই তীরের খেলা মহেন্দ্রনাথের নিজস্ব। তিনি একাগ্রতা ও আত্মবিশ্বাসের বলে এই খেলায় অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। একবার মান্দ্রাজের একটি লোক আসিয়া নানারকম তীরের খেলা দেখাইয়া সকলকে বিস্ময়ান্বিত



মহেন্দ্রনাথ

শুইয়া থাকিয়া ৭ মণ পাথর দুই হাতে অনায়াসে তুলিয়াছেন



মহেন্দ্রনাথ

২৫ হইতে ৪০ ফিট লম্বা আর ১৫ হইতে ২১ ফিট উঁচু স্থান মোটর সহ লাফ দিয়া পার হইতেছে

করেন। মহেন্দ্রনাথ তাহাকে ওস্তাদ মানিয়া তাহার খেলা শিখিতে চান। কিন্তু ব্যবসায়ী সুচতুর মান্দ্রাজীটি টালবাহানা করিয়া তাঁহাকে শিখিবার সুযোগ দেন না। ইহাতে অভিমানী মহেন্দ্রনাথ বড়ই ক্ষুব্ধ হন এবং নিজেই ধনুক লইয়া অভ্যাস করিতে থাকেন। বর্ত্তমান যুগের বাঙালী একলব্যের এই সাধনা ব্যর্থ হইল না। কালে তিনি একজন সুনিপুণ ধনুর্ব্বিদ হইয়া উঠিলেন। ঐকান্তিক একাগ্রতা ও অধ্যবসায় মহেন্দ্রনাথের অতি মাত্রায় ছিল বলিয়াই তিনি আচার্য্যের বিনা সাহায্যে এই লুপ্তপ্রায় প্রাচীন বিদ্যার অনুশীলনে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইতে পারিয়াছেন।

একবার মহেন্দ্রনাথ জামালগঞ্জ ও পার্ব্বতীপুর ষ্টেশনের মধ্যস্থানে কোন এক মেলায় খেলা দেখাইতেছিলেন। ঐ মেলার নিকটই একটি নদী। কোন জমিদারের মাহুত একটা পাগলা প্রকাণ্ড হাতীকে রোজ তাঁহার তাঁবুর সাম্‌নে দিয়া নদীতে লইয়া যাইত। যাইবার সময় হাতীটা তাঁবুর অনেক অনিষ্ট করিত। মহেন্দ্রনাথ নিষেধ করিলেও মাহুতটা তাহাতে কান দিত না। একদিন বাঁধা দেওয়ায় পাগলা হাতীটা মহেন্দ্রনাথকে হঠাৎ আক্রমণ করে। মহেন্দ্র পৃষ্ঠভঙ্গ দিবার লোক নন। তিনি একটা মোটা বাঁশ লইয়া হতীটাকে বেদম পিটাইতে আরম্ভ করিলেন। প্রায় আধঘণ্টা মার খাইয়া হাতীটা চীৎকার করিয়া পলাইয়া যায়। মনে তাঁহার অসীম বল ছিল বলিয়াই তিনি মরণের বুকে এমন ভাবে ঝাঁপাইয়া পড়িতেন।

মহেন্দ্রনাথ নিজের-হাতে-গড়া মানুষ। তিনি বলিতেন—বাঙালী যুবকদের ভিতর মনের বল, একাগ্রতা ও আত্মবিশ্বাস আনা চাই। তবেই তাহারা বলিষ্ঠ ও কর্ম্মিষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইতে পারিবে।

খাদ্য সম্বন্ধে তিনি বলিতেন,—আমরা সাধারণ বাঙালীরা যাহা খাইয়া থাকি তাহা নিয়মিত ভাবে বিচার পূর্ব্বক গ্রহণ করিলে ও নিয়মিত পরিশ্রম করিলে ইহাতেই যথেষ্ট শক্তি বাড়িতে পারে। দেশী ডন-কস্‌রত—মুগুরভাজা, বুকডন প্রভৃতিই ভাল। কিন্তু মিতাচারী ও মিতাহারী না হইলে শক্তি-সঞ্চয় অসম্ভব।

তিনি আরো বলিতেন,—যুবকগণ যদি পঁচিশ বছর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন এবং সমগ্র জীবন সংযমে পরিচালিত করেন, তবে শরীরে অমানুষিক বল পাইবেন।

মহেন্দ্রনাথ আক্ষেপ করিতেন,—দেশে শরীর-চর্চ্চার তেমন আয়োজন হইল না, সমস্ত দেশটা যেন ভয়ে জড়-সড়। ইহার একমাত্র কারণ শরীর-চর্চ্চার অভাব। শরীরে জোর না থাকিলে বুকে সাহস জাগে না। বাঙ্‌লার যুবকগণকে আজ এদিকেই মাথা ঘামাইতে হইবে।

বড়ই দুঃখের কথা, ১৩৩৭ সালে মহেন্দ্রনাথ ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার অন্তরাত্মা বাঙ্‌লার তরুণদিগকে ব্যায়াম চর্চ্চায় অনুপ্রেরণা দিক্।

মহেন্দ্রনাথের শুভেচ্ছা জয়যুক্ত হউক। বাঙ্‌লায় আবার দলে দলে ছেলেদের ভিতর সংহত-ভাবে ব্যায়াম-চর্চ্চা প্রচলিত হউক। তাহারা বজ্রকঠোর শক্ত-সমর্থ মানুষ হইয়া দাঁড়াক।

শ্যামসুন্দর গোস্বামী

যে পুণ্যতীর্থ শান্তিপুর ভক্ত বৈষ্ণবদের পূত প্রেমধারায় বহু শতাব্দী ধরিয়া প্লবমান রহিয়াছে, সেই শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ গোস্বামী বংশে ব্যায়ামাচার্য্য শ্যামসুন্দর গোস্বামী মহাশয় এক নূতনতর সাধনার বাণী লইয়া বাঙালীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। এই ক্ষত্রোচিত সাধনা ভাবগ্রাহী বাঙালীকে কর্ম্মঠ মানুষ করিবার সাধনা। বস্তুতঃ সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসংহত ব্যায়াম প্রণালী সাহায্যে বাঙালীকে পৃথিবীর বুকে বাঁচিয়া থাকিবার পথ করিয়া লইতে হইবে। এই পথে যাঁহারা দীপবর্ত্তিকা হস্তে জাতিকে পথ প্রদর্শন করিয়া চালিত করিতেছেন তাঁহাদের অন্যতম শ্যামসুন্দর।

ইংরাজী ১৮৯১ সালের ১১ই অক্টোবর (১২৯৮ সন ২৫শে আশ্বিন) রবিবার বীরাষ্টমী তিথিতে শ্যামসুন্দর জন্মগ্রহণ করেন। শান্তিপুর তাঁহার জন্মস্থান। তাঁহার পিতা "গোস্বামী ইন্‌ষ্টিটিউটের" প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন গোস্বামী। তাঁহার মাতার নাম শ্রীযুক্তা সুরেশ্বরী দেবী। বাংলাদেশে শরীর-চর্চ্চার জন্য শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন কি করিয়াছেন সে সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্যায়াম-ভবনের শিক্ষা দীক্ষা পাইয়াই শ্যামসুন্দর ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দ এ দেশে শরীর-চর্চ্চার একটা নব প্রেরণা আনিয়াছেন। বস্তুতঃ শ্যামসুন্দর উপযুক্ত পিতার যোগ্যতম পুত্র। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সম্বন্ধে

এ্যাথলেটিক ইণ্ডিয়ার (Athletic India) সম্পাদক লিখিয়াছিলেন—"I feel indebted to you for the life-long interest you have taken for the betterment of the whole of our race...I really take you to be a pillar of support to the cause of Indian physical culture. I must congratulate you for the worthy children you have built." স্বর্গীয় পীযূষকান্তি ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছিলেন, আমাদের জাতির ক্রমশঃ অপচীয়মান শারীরিক শক্তি যতীন্দ্রমোহনকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্রদিগকে শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ শিক্ষাদ্বারা সুগঠিত করিয়া তুলিবেন। তাঁহার সঙ্কল্প সফল হইয়াছে। তাই আজ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্যামসুন্দর গোস্বামী শারীরিক শক্তি-সামর্থ্যে এতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছেন যে ভার-রক্ষণে (weight supporting) তিনি জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। (—Sad Neglect of Physical Culture Among the Indians—ইংরাজীর মর্ম্মানুবাদ)

বাল্যকালে শ্যামসুন্দর মোটেই বলবান্ ছিলেন না। তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না এবং তিনি রোগা ছিলেন। তবে ছোটকাল হইতেই তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্প ও উচ্চ আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত ছিল। আজ যে তিনি ভারতের নানাস্থানে শরীর ও মনের উৎকর্ষ-বিধায়ক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন,

তাহার সহিত বিশ্ববিদ্যালয়-প্রবর্ত্তিত শিক্ষার কোন সম্পর্ক নাই। ইহা একমাত্র তাঁহার পিতৃদত্ত শিক্ষার ফল।

বর্ত্তমানে তিনি নিয়মিত ভাবে Liberty, Athletic India, Welfare, Modern Journal, Amrita Bazar Patrika, Sportsman, Tennis & Sports, প্রবাসী, বসুমতী, বঙ্গলক্ষ্মী, শান্তিপুর প্রভৃতি পত্রিকায় শরীর চর্চ্চা বিষয়ে সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন।

অতুলনীয় শক্তি-অর্জ্জনে, বজ্রবৎ শরীর-গঠনে, দুর্জ্জয় মনন-শক্তির সংবর্দ্ধনে পিতৃদত্ত উপদেশ ও আদেশই শ্যামসুন্দরকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সহায়তা করিয়াছে। নবজীবনের প্রারম্ভেই তিনি তদীয় পিতৃদেব কর্ত্তৃক 'মানুষ হওয়ার' মন্ত্রে দীক্ষিত হন।

যে শিক্ষা-প্রণালীদ্বারা তিনি শরীর-চর্চ্চাকে এক নবরূপ দিয়াছেন তাহা তদীয় তথ্য-নির্ণয়ের অক্লান্ত চেষ্টা, অবিচলিত অধ্যবসায়, গভীর গবেষণা, তুলনামূলক অধ্যয়ন, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সিদ্ধান্তগুলির পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ ও পরীক্ষা, ধীর পর্য্যবেক্ষণ, সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার স্বাধীন চিন্তা ও মৌলিকতা-প্রসূত। তাঁহার প্রণালী Goswami Method of Training & Treatment নামে পরিচিত। তিনি ব্যায়াম-চর্চ্চা দ্বারা যেরূপ শারীরিক শক্তি ও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিয়া থাকেন, আবার উহারই সাহায্যে রোগ নিরাকরণও করিতে পারেন। এই নিমিত্ত তাঁহার ব্যায়াম-চর্চ্চা দুই ভাগে বিভক্ত—

(১) গঠনমূলক ও (২) আরোগ্যমূলক। তিনি বর্ত্তমানে নিম্নলিখিত বিষয় আলোচনা করিতেছেন—স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য-সংগঠন, আয়ুর্বর্দ্ধন, জরানিরাকরণ, ব্যাধিনিবারণ, বলবৃদ্ধি, মেধাবৃদ্ধি, শুক্রজয়, সুন্দর সবল অপত্যোৎপাদনের উপায় ইত্যাদি।

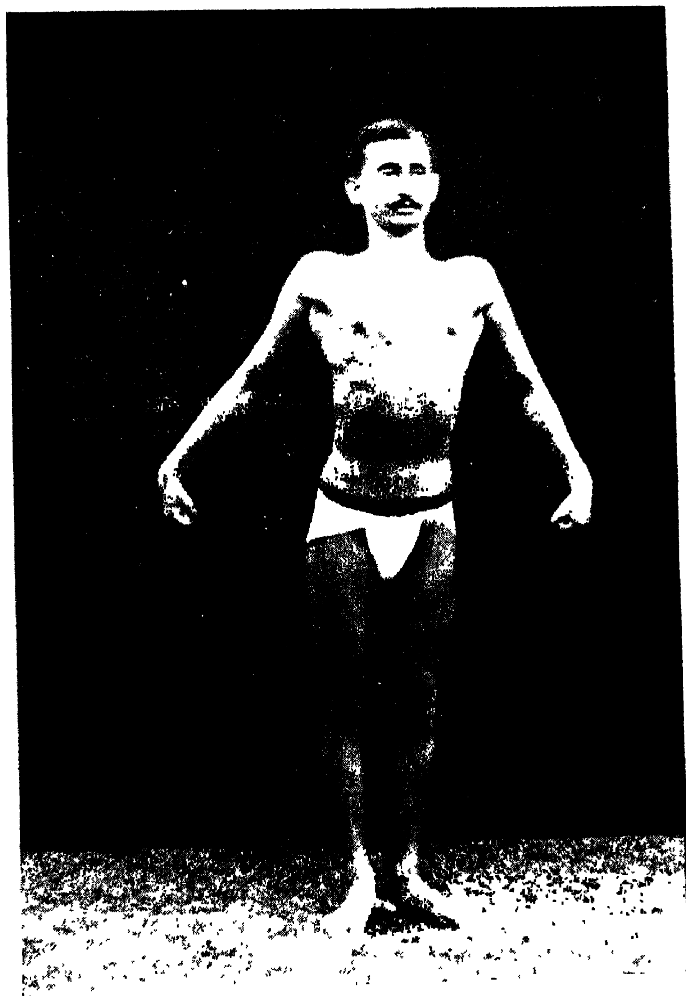
মহীশূরের মহারাজা, নরসিংহগড়ের মহারাজা কিষেণ প্রসাদ বাহাদুর প্রমুখ ভারতের বিখ্যাত রাজন্যবর্গের সমক্ষে শ্যামসুন্দর অনন্যসাধারণ শক্তির পরিচয় প্রদর্শন করিয়াছেন এবং বহুমূল্য উপহার লাভ করিয়াছেন। পিঠাপুরমের (মাদ্রাজ) মহারাজার 'হীরক পদক' তিনি লাভ করিয়াছেন। হায়দরাবাদের নিজাম ক্লাবে তিনি 'Iron man' নামে আখ্যাত হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি নেপালের মহারাজা, পিঠাপুরমের মহারাজা, রামনাদের রাজা, নবাব সালার জঙ্গ বাহাদুর, পারলা কিমেতির রাজকুমার প্রভৃতির ভূতপূর্ব্ব ব্যায়াম শিক্ষক (Physical Director) ছিলেন। বাঙালীর পক্ষে ইহা গৌরবের কথা বৈকি। শ্যামসুন্দরের শক্তিমত্তার পরিচয় সম্বন্ধে তাঁহার নিজের ভাষায়ই বলি—

That which enables me to support the weight of six tons and two elephants on my chest and half a ton on the throat; which keeps my muscles unflinched under pinchings with iron tongs by the strongest hands; which protects my abdominal region from the blows of best boxers, which has hardened my throat so as to



শ্যামসুন্দর গোস্বামী

(ব্যায়াম-চর্চ্চার ফলে)



শ্যামসুন্দর গোস্বামী

(ব্যায়াম-চর্চ্চার পূর্ব্বে)

baffle the attempts at throttling by eight strong men and to pass a loaded motor car across them; which has given me efficiency enough to continue concentrative mental work for twelve hours without a nervous breakdown is my favourite game.

শ্যামসুন্দর ৬ টন ওজন (প্রায় ১৬২ মণ) অথবা দুইটি হাতী বুকের উপর লইতে পারেন ; আধ টন ওজন গলার উপর লইয়া থাকেন ; ইনি শরীরের পেশীসমূহ যথেচ্ছ সঞ্চালন ও সঙ্কোচন করিতে পারেন—পেশীসমূহ সঙ্কোচনদ্বারা এতটা শক্ত করিতে পারেন যে অত্যন্ত সবল হস্তে তীক্ষ্ণ চিম্‌টাদ্বারা বিদ্ধ করিলেও তিনি অক্ষত ও অচঞ্চল রহেন ; পেটের পেশী সঙ্কোচন করিলে জোয়ান মুষ্টিযোদ্ধা তাঁহাকে ঘুষি মারিয়া মোটেও কাবু করিতে পারেন না ; তাঁহার গলায় মোটা দড়ি বা লোহার শিকল বাঁধিয়া আটজন লোক টানাটানি করিলেও তাঁহাকে ফাঁসি দিতে পারিবে না। শ্যামসুন্দর এক প্যাকেট তাস (৫২ খানা) একটানে দুই ভাগ, চারি ভাগ, আট ভাগ ও পরিশেষে ষোল ভাগে ছিন্ন করিতে পারেন। এতদ্ব্যতীত লোহার শিকল ভাঙা, লোহার মোটা শিক বাঁকা করা, দাঁত চুল ও অঙ্গুলী দ্বারা গুরুভার উত্তোলন করা—তাঁহার অনায়াস-সাধ্য কস্‌রৎ। শ্যামসুন্দরের উদ্ভাবিত বিনা অস্ত্রপ্রয়োগে বস্তি (Colon Lavage) বা অন্ত্রধৌতি (Alimentary Canal Washing) দ্বারা শরীরকে সুস্থ ও নিরাময় রাখা যায়। বিনা অস্ত্রে গুহ্যদ্বার দ্বারা শরীরের

অভ্যন্তরে জল প্রবেশ করাইয়া এবং উহা দ্বারা অভ্যন্তর ভাগ ধৌত করিয়া পুনরায় সেই জল বাহির করিয়া দেওয়া হয়। শ্যামসুন্দর বাবুর সুযোগ্য শিষ্য শ্রীমান্ দীনবন্ধু প্রামাণিক বহু স্থানে ইহার প্রণালী প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার ভাই শ্রীযুক্ত গৌরসুন্দর গোস্বামী ধনুর্ব্বিদ্যায় ক্ষিপ্রহস্ত ও শ্রীযুক্ত নিতাইসুন্দর গোস্বামী পেশী-নিয়ন্ত্রনে সুদক্ষ।

শ্যামসুন্দরবাবু তাঁহার এই ব্যায়াম-প্রণালীদ্বারা যক্ষ্মা, অজীর্ণ, অম্ল, চক্ষুরোগ, বাত এবং বহুবিধ কঠিন রোগ আরোগ্য করিয়াছেন। তাঁহার উদ্ভাবিত ব্যায়াম-প্রণালী সাহায্যে বৃদ্ধও তরুণ যুবা হইয়া দাঁড়াইতে পারে।

যাহাতে বাঙালী জাতি স্বাস্থ্য ও শক্তির অনুশীলন ও উৎকর্ষ সাধন করিয়া শক্তিশালী হইয়া উঠে—ইহাই শ্যামসুন্দর বাবুর সকল কর্ম্ম-প্রচেষ্টার একমাত্র লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যে শান্তিপুরের ব্যায়াম-শালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং যাহাতে এইরূপ প্রতিষ্ঠান দেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে তজ্জন্য ইনি জীবনপণ করিয়া ব্রতী হইয়াছেন। ইতোমধ্যে অনেক ছেলেমেয়ে ও যুবক যুবতী তাঁহার ব্যায়ামশালা হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। শ্যামসুন্দর বাবু ও তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় এখনও অবিবাহিত থাকিয়া এই কর্ম্ম-যজ্ঞে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। শ্যামসুন্দর বাবু যেমন একদিকে শারীর-চর্চ্চা প্রদর্শন করিয়া দেশের বুকে প্রেরণা যোগাইতেছেন, অপরদিকে

আবার গভীর গবেষণা ও নিবিষ্ট অধ্যয়ন দ্বারা আমাদের জাতীয় জীবনের এই অতি-প্রয়োজনীয় উপকরণটিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে দাঁড় করাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। আমেরিকার Natureo-pathy Association তাঁহার এই শরীর সম্বন্ধীয় গবেষণা সমর্থন করিয়াছেন।

শ্যামসুন্দরের এই প্রচেষ্টা সার্থক ও সফল হইয়া উঠুক্। বাঙালী জাতি আবার গর্ব্বোন্নত শিরে স্বাস্থ্য ও শক্তি লইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াক্।

অসি খেলায় বাঙালী

ননীলাল

লাঠি যদিও বা তার ক্ষীণ প্রাণশক্তি লইয়া বাঁচিয়া আছে, অসির সে দর্পিত ঝনৎকার আর বিদ্যুৎ-উজ্জ্বল চাহনি বাঙ্‌লাদেশে বড়-একটা দেখা যায় না। ক্ষাত্র-শক্তির মূর্ত্ত প্রতীক অসি আজ নির্ব্বাসিত, তার আশ্রয় মরচে-ধরা জীর্ণ খাপ। এমন একটা দরবারী বীরোদ্দীপক খেলা দেশে ঠাঁই পায় না!

বাঙ্‌লা দেশে যিনি এই মরণোন্মুখ খেলাটিকে নূতন করিয়া প্রাণদান করিয়াছেন তিনিই আমাদের অসিচালনে ক্ষিপ্র-কৌশলী শ্রীযুক্ত ননীলাল বসু। শ্রীযুক্ত ননীবাবু ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দ কলিকাতা তথা সমস্ত বাঙ্‌লায় অসি শিক্ষার একটা বন্যা ডাকিয়া আনিয়াছেন। ক্ষত্রিয়-সমাজে অপাংক্তেয় বাঙালীর যোগ্য আসনের অধিকার তলোয়ারের আগে ছিনাইয়া লইয়াছেন।

ননীলাল ১৮৮৭ সালে ২৪ পরগণার অন্তর্গত দক্ষিণ বেণীপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺ অভয়াচরণ বসু। ননীলালের যখন নয় বছর বয়স তখন তাঁহার বাবা মারা যান। মা-ই তখন তাঁহাকে লালন পালন করেন। কলিকাতাস্থ বালিগঞ্জে বাল্মীকি ষ্ট্রীটে ইঁহাদের একখানা বাড়ী আছে, এখন এখানেই থাকেন। ইঁহার মা কিছুদিন হয় মারা গিয়াছেন।



অসি খেলায় ননীলাল

বাল্যকালে ননীলাল গ্রামের পাঠশালায় পড়েন। এখানে ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত পড়িয়া ইহা পাশ করেন। তৎপর মাইনর স্কুলে ভর্ত্তি হন। ননীলালের বয়স তখন দশ এগার বছর। এই সময়ে কালীঘাটে "সন্তান সম্প্রদায়" নামে একটি সেবক-দল ছিল। ইঁহাদের কাজ ছিল গরীব-দুঃখীদের সাহায্য করা,অসুস্থ-পীড়িতদের আপদে-বিপদে সেবা-শুশ্রূষা ও সহায়তা করা। ননীলাল এই দলে ভর্ত্তি হইলেন। বিপন্ন দীন দরিদ্রের দুঃখে প্রাণ তাঁহার কাঁদিয়া উঠিত। যেখানে কেহ বিপদে পড়িয়াছে সেখানেই ননীলাল আপন ভুলিয়া সর্ব্বস্ব দিয়া তাঁহার পাশে আসিয়া নেহাৎ আপনার মানুষের মত দাঁড়াইয়া গিয়াছেন। এই দলে ভর্ত্তি হইয়া ননীলাল বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া চাঁদা তুলিতে আরম্ভ করেন, মুষ্টিভিক্ষা উঠাইয়া গরীব-দুঃখীদের বিলাইয়া দিলেন, রোগী ও পীড়িতের সেবা করিয়া কত বিনিদ্র রজনী যাপন করিলেন।

এই সময়ে একটি ঘটনা ঘটে যাহাতে ননীলালের জীবনে একটি আমূল পরিবর্ত্তন আনিয়া দেয়। ইহারই ফলে আমরা সাধারণ বাঙালী ছোক্‌রা ননীলালকে আজ অসাধারণ অসিনিপুণ বলিয়া গৌরব ও গর্ব্ব করিবার অবসর পাইয়াছি। ননীলাল একবার এক চৈত্র সংক্রান্তির চড়ক পূজার মেলা দেখিতে যান। সেই মেলায় একটা মারামারি হয়। একটি মুসলমান অনেকগুলি লোককে শুধু লাঠির জোরে হঠাইয়া দিতেছিল। অথচ যাহারা মার খাইতেছিল, তাহাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন বড় বড়

পালোয়ান এবং শক্ত-সমর্থ লোকও ছিল। কিন্তু মজা এই একটি লোকের লাঠির ঘায়ে এতগুলি লোক ছিট্‌কাইয়া পড়িতেছিল। দেখিয়া ননীলাল অবাক্ হইলেন, মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, যেমন করিয়া পারি লাঠি শিখিবই। তারপর খুঁজিতে খুঁজিতে সেই লোকটির বাড়ী গেলেন। তাহাকে দুইটি টাকা দিয়া বলিলেন—"আমাকে লাঠি শিখাতে হবে।" সে বলিল—"তুই ছেলে মানুষ, তুই কি শিখ্‌বি ?"

এই লোকটীর নাম ছিল আব্বাস। ইহার নিকট ননীলাল কিছুকাল লাঠি শিখেন। তারপর বনমালী নামে একজন বাগ্‌দীর নিকট হইতে লাঠি শিক্ষা করেন। কিন্তু ইহাদের কাহারো খেলাই তাঁহার নিত্যনূতন খেলার স্পৃহা ও অনুসন্ধিৎসু মনকে কিছুতেই তৃপ্ত করিতে পারিল না। অসন্তুষ্ট হইয়া ইহাদের নিকট হইতে চলিয়া আসিলেন এবং অনিশ্চিত ভাবে ঘুরিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, কার কাছে নূতন কিছু শিখি। বছরখানেক এমনিভাবে কাটিয়া গেল। এই সময়ে নিজের বাড়ীতেই কেবল চারি পাঁচটি ছেলে লইয়া লাঠিখেলার চর্চ্চাটা বাঁচাইয়া রাখিলেন।

এই সময়ে কলিকাতায় শ্রীযুক্তা সরলাদেবী চৌধুরাণীর বাড়ীতে বীরাষ্টমী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই উপলক্ষে একটী বিরাট উৎসবের আয়োজন হয়। ইহাই বাঙ্‌লা দেশে প্রথম বীরাষ্টমী উৎসব। সে প্রায় বিশ বছর আগেকার

কথা। বাঙ্‌লা দেশে শরীর-চর্চ্চার একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়া দেশের দুর্ব্বল পঙ্গু ও হৃতবীর্য্য তরুণদলকে স্বাস্থ্যে ও শৌর্য্যে শ্রীসম্পন্ন করিয়া তুলিবার ইহাই প্রথম সংহত প্রচেষ্টা। সেবারকার এই বীরাষ্টমী উৎসব দেখিতে ননীলাল শ্রীযুক্তা সরলাদেবীর বাড়ীতে যান। সেখানে বাঙ্‌লার অনেক বিখ্যাত খেলোয়ার সমবেত হন। রাজপুতানা, পঞ্জাব প্রভৃতি দেশের অনেক অসিনিপুণ এবং মল্লবীরও ইহাতে উপস্থিত হন। এই উৎসবের তলোয়ার খেলা দেখিয়া ননীলালের খুব ইচ্ছা হয়, একটু তলোয়ার ঘুরাইয়া দেখান। তখনও কিন্তু তিনি তলোয়ারের একরকম কিছুই জানেন না এবং শিখেনও নাই। কেবল লাঠি যাহা কিছু শিখিয়াছিলেন তাহারই অভিজ্ঞতা ও ভরসায় তলোয়ার লইয়া খেলার আসরে নামিয়া পড়িলেন। সে সময়ে তাঁর বয়স চৌদ্দ পনর বছর। এতটুকু ছেলেকে এমন সুন্দর তলোয়ার ঘুরাইতে দেখিয়া উপস্থিত সকলেই খুব সন্তুষ্ট হন এবং খুসী হইয়া তাঁহাকে একটি মেডেল পুরস্কার দেন। সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত শ্রদ্ধেয়া সরলাদেবী ননীলালকে আপদে বিপদে সাহায্য করিতেছেন, যখন সকলে তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া ফেলিয়া গিয়াছে, এই বীরাঙ্গনা মাতৃমূর্ত্তিই তাঁহাকে ও তাঁহার দলকে বুক ভরা স্নেহ দিয়া জড়াইয়া রাখিয়াছে। বীরাষ্টমীর এই প্রথম সফলতাই তাঁহাকে সব সময় উৎসাহের ইন্ধন যোগাইতে লাগিল। তিনি সঙ্কল্প করিলেন, তলোয়ার শিখিতেই হইবে।

এই সময়ে মল্লিকলেনে ননীলাল নিজেই একটি আখ্‌ড়া খোলেন। সেখানে নূতন উদ্যমে কুস্তি ও লাঠির চর্চ্চা করিতে থাকেন এবং ছোট ছোট ছেলেদিগকে শিক্ষা দিয়া ভাল কুস্তিগীর ও লাঠিয়াল করিয়া গড়িয়া তোলেন। এখনও এইখানেই ননীলালের ক্লাব, ইহার নাম রাখিয়াছেন 'আর্য্যকুমার সমিতি'।

ননীলালের পরিচিত এক ভদ্রলোক রাজপুতানার কোটায় কাজ করিতেন। কলিকাতার সেবারকার প্রদর্শনীর পর ননীলালের সহিত তাহার দেখা হয়। তিনি বলিলেন,—তুমি আমার সঙ্গে কোটায় চল, সেখানে খুব ভাল তলোয়ার শিখিতে পারিবে। সেখানকার রাজপুতরা চমৎকার তলোয়ার খেলে। ননীলালের তখন তলোয়ার খেলার মস্ত সখ, ঝোঁকটা আরো বেশী। তিনি সহজেই স্বীকার পাইয়া তাহার সঙ্গে কোটায় চলিয়া গেলেন। সেখানে এগার মাস থাকেন, ঘুরিয়া ঘুরিয়া তলোয়ার খেলা দেখিয়া বেড়ান। কিন্তু বাঙ্‌লাদেশে যে খেলা দেখিয়া এবং শিখিয়া গিয়াছিলেন তার চেয়ে নূতনতর খেলা তেমন বড়-একটা দেখিতে পাইলেন না। যাহা দুই একটা নূতন কিছু শিখিলেন তাহাই দরিদ্রের সম্বলের মত পক্ষপুটে জড়াইয়া হতাশ হইয়া বাঙ্‌লায় আপনার জন্মভূমি ও কর্ম্মভূমিতে ফিরিয়া আসিলেন।

এই সময়ে কলিকাতা মনোহরপুকুর বাগানে শিবনারায়ণ পরমহংস বাস করিতেন। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া ননীলাল

পরমহংসদেবের কথা শুনিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যান এবং সেই বাগানেই লাঠি খেলার একটি আড্ডা স্থাপন করেন। একদিন যখন ননীলাল খেলিতেছিলেন পরমহংসদেব তাঁহার খেলা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে তলোয়ার খেলার কতকগুলি নূতন বিষয় শিখাইয়া দেন। এইরূপে কয়েকদিনের মধ্যে পরমহংসদেব ননীলালকে একজন পাকা তলোয়ার-খেলোয়ার করিয়া তুলেন। পরমহংসদেব বলিতেন, আমার এসব মহারাজ পৃথ্বীরাজের প্রণালীর খেলা। মহারাজ পৃথ্বীরাজ নাকি এই পদ্ধতিতে খেলিতেন। এইখানেই ননীলাল নিয়মিত ভাবে ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অসি-শিক্ষায় শিক্ষা প্রাপ্ত হন এবং এই পরমহংসদেবের পাদমূলেই তাহার শেষ শিক্ষানবিশীর সমাধা হয়। ননীলাল বর্ত্তমানে তলোয়ারের যে সমস্ত খেলা দেখান সে সমস্তই এই মহাপুরুষের শিক্ষার ফল।

ইহার পর হইতে ননীলাল নিজের আখড়ায় বাঙালী ছেলেদের কুস্তি, লাঠি ও অসি শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন। বাঙালী ছেলেরা যাহাতে বলিষ্ঠ ও কর্ম্মিষ্ঠ হইয়া উঠে ইহাই তাঁহার একমাত্র সঙ্কল্প। এই উদ্দেশ্যে তিনি শরীরচর্চ্চার উৎসাহ দিবার জন্য নানাস্থানে তাঁহার অসাধারণ অসিনৈপুণ্য দেখাইয়া বাঙালী তরুণ দলে অনুপ্রেরণা দিতেছেন। কলিকাতার ভবানীপুর দেশবন্ধু ব্যায়ামশালায় তিনি রীতিমত এবং নিয়মমত কুস্তি, লাঠি ও অসি শিখাইতেছেন।

খেলা-ধূলায় বাঙালী

বলাই

বলাই চাটুয্যের নাম শুনে নাই এমন ছেলে এদেশে বিরল। বলাই খেলোয়ার দলের মুকুটমণি—এমন খেলা নাই যাহাতে বলাই নাম না করিয়াছেন। ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, দৌড়াদৌড়ি, বক্সিং (মুষ্টিযুদ্ধ) যাহা কিছু বল, সবটাতেই বলাই ওস্তাদের সেরা। এমন সব-খেলায়-ওস্তাদি অনেক দেশেই মিলে কম। বিদেশী খেলা খেলিয়া বিদেশীর সাথে টক্কর দিয়া বাঙালীর শরীর-চর্চ্চার নজীরখানি বলাই-ই তো জগতের বীরেন্দ্র-সভায় পেশ করিয়া বাঙালীর মান রাখিয়াছেন।

হুগলীজেলার অন্তঃপাতী চুঁচূড়ার নিকটস্থ ডুমুরদহ গ্রামে বলাই জন্মগ্রহণ করেন—১৯০০ সালের মার্চ্চ, বাংলা ৯ই চৈত্র মঙ্গলবারে। বলাইর বাবার নাম ৺রামলাল চট্টোপাধ্যায়। বলাই বাপের তৃতীয় ও কনিষ্ঠ পুত্র। সাধারণে ইঁহারা ডুমুরদহের বাবু বলিয়া পরিচিত। ইঁহারা সেখানকার জমিদার।

বর্দ্ধমান জেলার বাদলা গ্রামে বলাইর মামা-বাড়ী। সেইখানে বলাইর লেখাপড়া সুরু হয়। বলাই ১৯১০ সাল পর্য্যন্ত বাদলা উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ে পড়েন।

১৯১১ সালে বলাই কলিকাতা স্কটিশ চার্চ্চেস্ স্কুলে আসিয়া ভর্ত্তি হন এবং এই স্কুল হইতেই ১৯১৯ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা

দেন। ১৯১৬ সাল হইতেই বলাই সমস্ত রকম খেলায় সমানভাবে যোগ দিতে স্বুরু করেন। এই বছরই হিন্দুস্কুলের সহিত একটি ফাইনেল খেলায় বলাই যোগ দেন। খেলার প্রতিযোগিতায় বলাই এই প্রথম যোগদান করেন। ইহার পরের বছর নিখিল ভারত স্কুল প্রতিযোগিতায় তিনি প্রথম হন এবং একটি শিল্ড ও মেডেল পুরস্কার লাভ করেন। বলাইর জীবনে এই প্রথম পুরস্কার পাওয়া। সেই বছরই তাহার যোগ্যতার পরিচয় পাইয়া তাহাকে কলেজ টিমে লওয়া হয়।

১৯১৮ সালেও তিনি স্কুলের চ্যাম্পিয়নশিপ এবং Calcutta Athletic Junior Sport Championship পান। কালী-ঘাটের Sportএ মিঃ ডাফ্‌রেকে long jumpএ হঠাইয়া দেন। সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত বলাই প্রতিযোগিতায় high jump, hurdles প্রভৃতিতে championship পাইয়া আসিতেছেন।

১৯১৭ সালে তিনি Y. M. C. A. তে প্রথম ফুটবল খেলেন—কলিকাতা টিমের (Calcutta Team) বিপক্ষে। ১৯১৮ সালে এরিয়ান ক্লাবে (Aryan Club) ভর্ত্তি হন এবং সকল অবস্থানেই (position) খেলেন।

ইহার পর হইতে বলাই মোহন বাগান ক্লাবে Centre Half-এই সাধারণতঃ খেলিয়া আসতেছেন। গত কয় বছর যাবত কলিকাতায় ভারতীয় বনাম য়ুরোপীয় এবং সিভিল বনাম মিলিটারী যত খেলা হইয়াছে প্রত্যেক খেলায়ই তিনি যোগদান

করিয়াছেন। বলাই ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র—বোম্বাই, লক্ষ্ণৌ, সিমলা, মান্দ্রাজ, রেঙ্গুন প্রভৃতি বড় বড় সহরে—এমন কি শিঙ্গাপুর, যবদ্বীপ প্রভৃতি দূরদেশেও খেলিতে গিয়াছেন। সব জায়গায়ই অজস্র প্রশংসা পাইয়াছেন।

১৯১৭ সাল হইতে তিনি হকি ও ক্রিকেট খেলা অতি সুখ্যাতির সহিত খেলিতেছেন। ক্রিকেট খেলায় bowling ও bating দুইটাতেই তিনি ওস্তাদ। গত বছর (১৩৩৩ সাল) শিবপুর কলেজের বিপক্ষে খুব ভাল খেলেন। ৮ run-এই ৭ জন কাবার! ব্যাটিংএও তিনি মোহনবাগানের পক্ষে গত বছর (১৯২৫-২৬ সাল) ১০০০ run করেন। Xaveriansএর (কলিকাতার একটি য়ুরোপীয় দল) বিরুদ্ধে এক খেলায় আধ ঘণ্টায় ৮৪ run করেন ; তাহার মধ্যে ১২টিই করিয়াছিলেন over boundary.

বলাই ১৯১৭ সাল হইতে ১৯২০ সাল পর্য্যন্ত সিটি এ্যাথ্‌লেটিক ক্লাবের (City Athletic Club) যে কোন অবস্থানে (position) হকি খেলিতেন। ১৯২১ সালে মোহনবাগান ক্লাবে তিনি ফুটবল, হকি, ক্রিকেট, বাস্কেট বল, ভলি বল, দৌড়ান, লাফান (high and long jump), hurdle, বহুদূরব্যাপী দৌড় প্রভৃতি সমস্ত ক্রীড়াতেই সমভাবে যোগদান করেন। বাঙ্‌লাদেশে বলাই-ই প্রথম ১০ মাইল দৌড়ের প্রতিযোগিতা প্রবর্ত্তন ও প্রচলন করেন। ১৯২৩ সালে প্রথমবার এই দৌড়ে

১৪ জন প্রতিযোগী দৌড়ায় এবং কলিকাতা হইতে সোদপুর পর্য্যন্ত ১১ জন গিয়া পৌঁছে। ১৯২৬ সালে প্রতিযোগীর সংখ্যা দাঁড়ায় ২৪ জন। তাদের মধ্যে ২০ জন যাইয়া গন্তব্যস্থানে পৌঁছে। ইহাদের সাথে ১২ বছরের একটি ছেলেও ছিল। সেও হাসিমুখে ১০ মাইল দৌড়াইয়া গিয়াছিল এবং দ্বাদশ স্থান অধিকার করিয়াছিল।

বলাইর দৌড়ের তালিকা ঃ—

১০ মাইল—১ ঘণ্টা ৬ মিনিট ; $\frac{১}{২}$ আধ মাইল—২ মিনিট ৭ সেকেণ্ড ; ৪৪০ গজ—৫২$\frac{৪}{৫}$ সেকেণ্ড; ২২০ গজ—২০$\frac{১}{৫}$ সেকেণ্ড ; ১০০ গজ—১০$\frac{৩}{৫}$ সেকেণ্ড।

Hurdle race এর (বেড়া ডিঙাইয়া দৌড়) তালিকা ঃ—

২২০ গজ—২৭$\frac{৩}{৫}$ সেকেণ্ড। ১২০ গজ—১৬$\frac{১}{৫}$ সেকেণ্ড।

হাই জাম্প (High Jump) ঃ—৫ ফিট্ ৯ ইঞ্চি।

লং জাম্প (Long Jump) ঃ—২১ ফিট্ ৫ ইঞ্চি।

কলিকাতা ব্যতীত দার্জ্জিলিং, কুর্শিয়ং, পুণা, বোম্বাই, দিল্লী, সিমলা, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে বলাই দৌড়ের প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন।

আত্মরক্ষার জন্য বক্সিং বা মুষ্টিযুদ্ধের মত সহজ ও অব্যর্থ উপায় আর নাই। বিলাতী খেলার মধ্যে এমন বীরোচিত খেলা কমই আছে। মিলটন কিউব্স ভারতের নামকরা "মধ্য ওজনের বাহাদুর" (Middle Weight Champion)। বলাই প্রথম

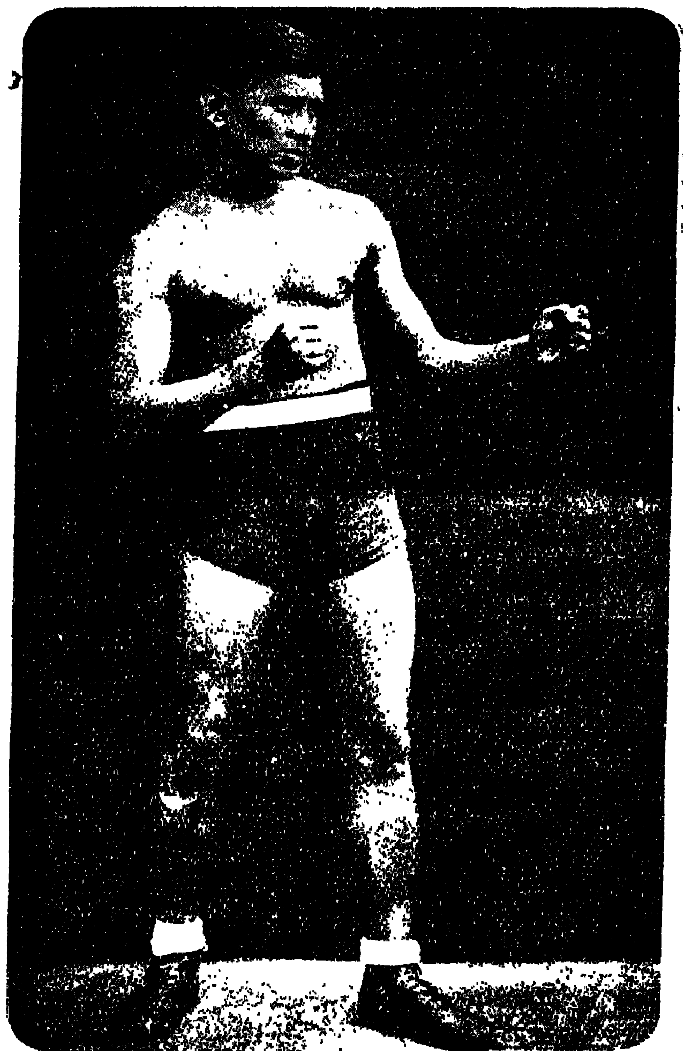
কয়েকদিন তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করেন (১৯২৫ সাল ১৭ই এপ্রিল)। তারপর বড় বড় বক্সারদের খেলা দেখিয়া নিজে নিজেই শিখেন। শিক্ষালাভের কিছুদিন পরেই কলিকাতা এম্পায়ার থিয়েটারে একটি য়ূরোপীয়ের সহিত প্রতিযোগিতায় বক্সিং খেলেন এবং তাহাকে হারাইয়া দেন। বলাইর এই অভাবিত জয়লাভে সকলেই বিস্মিত হয় এবং বলাইর জয় জয়কার পড়িয়া যায়।

ইহার পর ১৯২৫ সালে ২৫ শে নবেম্বর কলিকাতা Y. M. C. A.র উদ্যোগে বাঙ্‌লার লাট সাহেব লর্ড লিটনের উপস্থিতিতে বলাই বক্সিং খেলেন। ১৯২৬ সালে ১৬ই জানুয়ারী শনিবার ভবানীপুর কিং কার্নিভালে বলাই সার্জেণ্ট ডে'র সহিত বক্সিং খেলেন। সার্জেণ্ট ডে ভারতের নাম-করা মুষ্টিযোদ্ধা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সার্জেণ্ট ডে বলাইর সহিত খেলায় ঘুষি সহ্য করিতে না পারায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। বলাই এ পর্য্যন্ত যে কয়টি বক্সিং প্রতিযোগিতায় খেলিয়াছেন প্রায় সব কয়টিতেই তিনি জয়ী হইয়াছেন।

বলাই বলেন—"বক্সিং শিক্ষা করিতে হইলে কতকগুলি নিয়ম বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে। বক্সিং করিতে হইলে চোখের দৃষ্টির প্রখরতা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা এবং তৎপরতা একান্ত দরকার। মার খাইয়াও যাহাতে পিছু হটিতে না হয় এমনতর ধৈর্য্য ও সহনশীলতা চাই।"



বলাই (মুষ্টিযুদ্ধে)



জগৎশীল (মুষ্টিযুদ্ধে)

বলাই আমাদের মত সাধারণ ভাত তরকারীতেই পুষ্ট। তিনি নিরামিষ খাদ্যের খুব ভক্ত। দধি ও মিষ্টি তাহার বড়ই প্রিয়। বলাই কোনপ্রকার মাদকদ্রব্য স্পর্শও করেন না। এমন কি চা, পান, সিগারেট প্রভৃতি কিছুই খান না।

ছেলে বুড়া সকলকেই শরীর-চর্চ্চা দ্বারা উন্নত ও বলিষ্ঠ করিয়া তোলাই বলাইর সঙ্কল্প। এই উদ্দেশ্যে তিনি উপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

বলাই বলেন—ব্যায়াম কর্‌লেই শরীরটা সবচেয়ে ভাল থাকে—বিশেষতঃ যারা নিরামিষ খান তাদের। শরীর সুস্থ ও সবল কর্‌তে হলে সকলের আগে তামাক পান চুরুট ছাড়্‌তে হবে, বায়স্কোপ থিয়েটার যাওয়া বন্ধ কর্‌তে হবে। Any sport is best, but after game talking is bad for a young boy—ছেলেদের পক্ষে যে কোন খেলাই ভাল, কিন্তু খেলা-ধূলার পর আড্ডাবাজী করাটাই ভয়ঙ্কর খারাপ। এমন ছেলের সাথে বন্ধুত্ব কর্‌বে যে তোমার জন্যে জীবন দিতে পারে। সৎ সংসর্গ চাই-ই যে।

জগৎশীল

বাঙালী মুষ্টিযোদ্ধাদের মধ্যে যাঁহারা খ্যাতি ও যশ অর্জ্জন করিয়া আত্মরক্ষার ক্ষত্রোচিত এই মহাস্ত্রটিকে বাঙ্‌লাদেশে প্রচালনের সহায়তা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে বলাই চাটুয্যে ও জগৎশীল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বলাইর কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

এক্ষণে শ্রীযুত জগৎকান্ত শীলের কথা বলিব। জগৎকান্ত সাধারণে "জগা শীল" বলিয়াই পরিচিত।

ইংরাজী ১৯০৬ সালে কলিকাতায় জগৎকান্ত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা বিখ্যাত ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী শীল। জগৎকান্ত কলিকাতাস্থ বহুবাজার স্কুলে লেখাপড়া সমাপ্ত করিয়া মান্দ্রাজের Physical Training College হইতে (শরীর চর্চ্চা বিদ্যালয়) প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট লইয়া আসেন। ইনি ভারতের বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা মিল্‌টন্‌ কিউব্‌সের নিকট মুষ্টিযুদ্ধ শিক্ষালাভ করেন। কলিকাতায় "জুনিয়ার" বা ছোট দলের মধ্যে জগৎকান্ত চৌকস (all-round) খেলোয়ার বলিয়া নাম করিয়াছিলেন। ১৯২৪ সালে ইনি মোহনবাগান ক্লাবে ভর্ত্তি হইয়া ঐ বছর হইতে ১৯২৮ সাল পর্য্যন্ত ফুটবল খেলিয়াছিলেন। বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েসনের উদ্যোগে ১৯২৪ সালের ১০ মাইল দৌড় ও ১৯২৬ সালের ৫ মাইল দৌড়-প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। ১৯২৭ সালে ৫ মাইল দৌড় প্রতিযোগিতায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ফুটবল, হকি, ক্রিকেট, টেনিস্‌, সাঁতার, দৌড়ঝাঁপ প্রভৃতি সকল খেলাতেই জগৎকান্ত সমভাবে যোগদান করিয়াছেন। কিন্তু বক্সিং বা মুষ্টিযুদ্ধে তিনি যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহাতেই তাঁহাকে যশস্বী করিয়া তুলিয়াছে।

১৯২৫ সালে কলিকাতায় প্রথম কিং কার্ণিভালে তিনি

বক্সিংএ নামেন। ইহার পর হইতে কলিকাতার খুব কম প্রতিযোগিতাই তাঁহার বাদ পড়িয়াছে। মান্দ্রাজে অবস্থান কালে তিনি পনরটি বক্সিং প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে তিনি অধিকাংশেই জয়লাভ করিয়াছিলেন। আজ পর্য্যন্ত তিনি ৩৫টি বক্সিং-যুদ্ধ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ২৫টিতে তিনিই জিতিয়াছেন। ১৯২৮ সালে কলিকাতা পার্ল সিনেমাতে বিখ্যাত মুষ্ঠিযোদ্ধা উইলি কার্টারকে এবং ১৯৩০ সালে আমেরিকান সার্কাসে প্রসিদ্ধ ফিলিপীয় বক্সার রস কার্লোকে পরাজিত করেন।

বর্ত্তমানে জগৎকান্ত কলিকাতা কর্পোরেশনের Playground Physical Director এবং অন্যান্য অনেক শরীর-চর্চ্চার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন। School of Physical Culture এর তিনি অবৈতনিক পরিচালক। এই প্রতিষ্ঠানটি শরীর-চর্চ্চায় বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিতেছে। বস্তুতঃ জগৎকান্তের শিক্ষাদানপ্রণালী বড়ই চিত্তাকর্ষক ও জনপ্রিয়। তিনিই আমাদের দেশে সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় স্কুল সমূহের মধ্যে বক্সিং-প্রতিযোগিতা প্রচলিত করিয়াছেন। জগৎকান্ত মধ্যমাকৃতি ও ক্ষিপ্রকৌশলী তরুণ যুবা। তাঁহার এই প্রচেষ্টা বাঙালী ছেলেদের কঙ্কালসার দেহগুলিকে সুঠাম ও শক্তিমান্ করিয়া তুলুক্।

লাঠিখেলায় বাঙালী

বাঙালী চিরকালই লাঠিখেলায় অভ্যস্থ ছিল। কোম্পানীর আমলেও লাঠির অপ্রতিহত প্রভাব ছিল। সেকালের শিক্ষিত লাঠিয়ালগণের অসীম ক্ষমতা ও কর্ম্মকুশলতা লক্ষ্য করিয়া মনস্বী বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—

"হায় লাঠি! তোমার দিন গিয়াছে। তুমি ছার বাঁশের বংশ বটে, কিন্তু শিক্ষিত হস্তে পড়িলে তুমি না পারিতে এমন কাজ নাই। তুমি কত তরবারী দুই টুক্‌রা করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছ, কত ঢাল খাড়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছ; হায়! বন্দুক আর সঙ্গীন তোমার প্রহারে যোদ্ধার হাত হইতে খসিয়া পড়িয়াছে। লাঠি! তুমি বাঙ্গলাব আব্রু পরদা রাখিতে, মান রাখিতে, ধান রাখিতে, ধন রাখিতে, জন রাখিতে, সবার মন রাখিতে। বদমাইস তোমার ভয়ে ত্রস্ত ছিল, ডাকাত তোমার জ্বালায় ব্যস্ত ছিল, নীলকর তোমার ভয়ে নিরস্ত ছিল, তুমি তখনকার পিনালকোড ছিলে।"

সেকালের ভূস্বামিগণের পাইক সর্দ্দার ও লাঠিয়ালগণের সাহস ও শৌর্য্যবীর্য্যের কীর্ত্তিকথা আজও লোকের মুখে মুখে কিংবদন্তীতে জীবিত রহিয়াছে। বিক্রমপুরের যুদ্ধের পর মানসিংহ, কেদাররায়ের রাজ্য তাঁহার প্রধান অমাত্য রঘুরামের

হস্তে অর্পণ করিয়া যান। রঘুরামের প্রধান সর্দ্দার রামমালিকের লাঠিখেলার অদ্ভুত নিপুণতার কাহিনী আজিও লোকে গাহিয়া থাকে—

"রামমালিকের লাঠি
রঘুরায়ের মাটী ॥
উঠ্‌লে লাঠির ডাক।
দৌড়ে পালায় বাঘ ॥
গুলি ফিরে ঝাঁকে।
রামের লাঠির পাকে ॥
মালিক ধরে লাঠি।
যম যেন সে খাটি ॥"

এমন কত রামমালিক সেকালের বাঙলার পাড়ায় পাড়ায় বিরাজ করিত।

পুলিনবিহারী দাস

বস্তুতঃ লাঠি-খেলোয়ারের অভাব বাঙ্‌লা দেশে কোন কালেই হয় নাই; কিন্তু শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দাসই সর্ব্বপ্রথম দেশের শিক্ষিত ও ভদ্র তরুণদের ভিতর সংহত ভাবে ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লাঠি শিখান। অন্যান্য লাঠিয়ালদিগের চেয়ে পুলিনের এই জায়গায়ই পার্থক্য ও শ্রেষ্ঠত্ব। বিশেষ করিয়া ছোট লাঠি আজ পর্য্যন্ত এমন সুন্দর নিয়মে ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষাদান করা লাঠির জন্ম-ও-কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষের কোন

প্রদেশেই হইয়া উঠে নাই। ইহা আমাদের বাঙলার গৌরবের কথা বৈ কি।

১৯০৩ সালে পুলিন প্রথম লাঠি শিক্ষা আরম্ভ করেন—একটি মুসলমান লাঠিয়ালের নিকট। কিন্তু তাহার নিকট বেশী কিছু শিখিতে পারিলেন না। ইহার কিছু পরেই লর্ড কার্জন ঢাকা আসিলে ঢাকার তৎকালীন নবাব সাহেব প্রসিদ্ধ খেলোয়ার প্রোঃ মার্ত্তাজাকে লাঠি খেলা দেখাইবার জন্য আনয়ন করেন। মার্ত্তাজা একজন যাদুকর ও সার্কাস-ওয়ালা ছিলেন। তিনি ঠগীদের সহিত জেলে থাকিবার সময় তাহাদের নিকট হইতে লাঠি শিখেন! ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপাল পি কে রায় মার্ত্তাজাকে একদিন কলেজে খেলা দেখাইতে বলেন। এই সময় পুলিন তাঁহার নিকট লাঠি শিক্ষার সুযোগ পাইলেন। অধ্যবসায়ী পুলিন মার্ত্তাজার খেলা দেখিয়া অল্প কিছু মাত্র আয়ত্ত করিতে পারিলেন। ইহার পর মার্ত্তাজা যখন কলিকাতার নিকটবর্ত্তী শ্রীরামপুরে থাকিতেন, তখন পুলিন তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাহার নিকট হইতে ধীরে ধীরে লাঠির ঘাত কৌশল শিখিয়া লন।

এই সময়ে বীরাষ্টমী পূজা ও ডাঃ পি কে রায় মহোদয়ের বিদায়োপলক্ষে পুলিন সর্ব্বপ্রথম সর্ব্বসাধারণে তাঁহার লাঠি খেলার কৃতিত্ব দেখাইয়া প্রশংসা পান। এই সময় হইতে পুলিনের নাম সকলের নিকটই পরিচিত হয়। তখন পুলিন ঢাকা কলেজের লেবরেটারী অ্যাসিষ্টান্টের কাজ করিতেন।

১৯০৫ সালে কলিকাতায় ব্যারিষ্টার পি মিত্র, মনীষী বিপিন পাল প্রমুখ দেশ নেতাদের উদ্যোগে যুবকগণের মধ্যে শরীর-চর্চ্চার আন্দোলনটী মূর্ত্ত হইয়া উঠে, এবং নানা স্থানে ব্যায়াম-চর্চ্চার সমিতি গঠিত হয়। পুলিন তাহাদের অন্যতম পরিচালক মনোনীত হইয়া ঢাকায় আসেন।

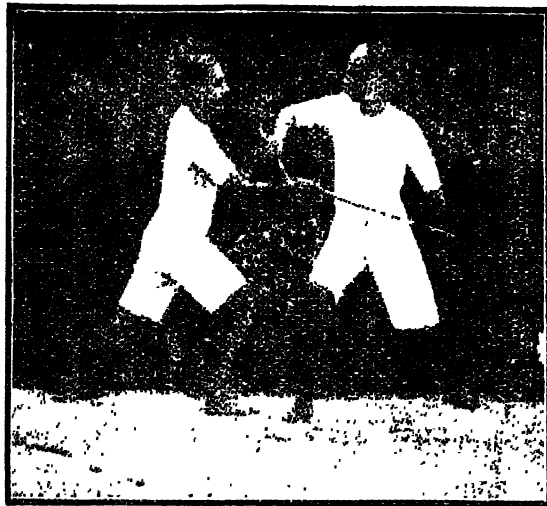
ঢাকায় পুলিন স্বামীবাগ আশ্রমে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া যুবকদিগকে লাঠিখেলা শিখাইতে আরম্ভ করিলেন। ছাত্র, চাকুরীজীবী, উকীল প্রভৃতি উৎসাহের সহিত লাঠি খেলা আরম্ভ করিলেন। অনধিক দুই বৎসরের নিয়মিত ব্যায়াম-চর্চ্চায় ঢাকার তরুণদলের চেহারা বদলাইয়া গেল। যাহারা অলস, দুর্ব্বল ও ভীরু বলিয়া উপহসিত হইত, তাহারা যেন যাদুস্পর্শে সুস্থ, সবল ও সাহসী হইয়া উঠিল।

এই সময় নানাস্থানে মুসলমান-অত্যাচার দেশের এই নব-জাগ্রত আন্দোলনটীকে আরো সবল ও শক্তিমান্ হইবার সুযোগ করিয়া দিল। লোক দলে দলে দলবদ্ধ হইতে লাগিল এবং লাঠি শিখিয়া নারীর মর্য্যাদা ও আত্মরক্ষায় সক্ষম হইয়া উঠিল। এই সময়কার কৃত্রিম লাঠির লড়াই (mock-fight) বাস্তবিকই একটা প্রাণশক্তি জাগাইয়া দিয়াছিল। মার না খাইলে কেহ মার দিতে পারে না। আবার মারামারি করিতে হইলেও দশটা মার পিঠ পাতিয়া সহ্য করিবার মত ক্ষমতা ও ইচ্ছা লইয়াই যাইতে হয়। এই সমস্ত কৃত্রিম লড়াইয়ে সাহস,

ক্ষিপ্রকারিতা,দল-চালনা প্রভৃতি পৌরুষজনক গুণগুলির অনুশীলন হয়। দুই দলে যখন লাঠি হাতে ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া ভীষণবেগে পরস্পরের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িত এবং লাঠির ঘাত-প্রতিঘাতে খেলার মাঠ মুখরিত হইয়া উঠিত, সে একটা দেখিবার দৃশ্য ছিল। এম্‌নি করিয়াই সেদিন জাতি গড়িয়া উঠিয়াছিল, জাতির প্রাণশক্তি সজীব ও সতেজ হইয়াছিল।

১৯২৬ সালের কলিকাতা দাঙ্গার সময় পুলিন আশ্চর্য্য কাজ করিয়াছেন। হিন্দুর মন্দির রক্ষার্থ তিনি নিজের জীবনের মমতা ভুলিয়া দিনরাত্রি পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ঠন্‌ঠনিয়ার কালীবাড়ী দুর্ব্বৃত্তেরা বার বার আক্রমণ করিয়াও শুধুমাত্র পুলিনের বীরত্বে ও কর্ম্মকৌশলে কিছুই করিতে পারে নাই।

পুলিনের "লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা" বাঙ্‌লা সাহিত্যে একটা যুগান্তর আনিয়াছে। এমন বিস্তৃতভাবে ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লাঠির কথা, লেখায় আর প্রকাশ হয় নাই। লাঠি ও অসিতে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতার সুস্পষ্ট প্রমাণ ইহাতে আমরা পাই; ইহা ছাড়া পুলিন যে ছোরাখেলায় ও জুজুৎসু বিদ্যায়ও অসামান্য কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও আমরা জানিতে পারি।



পুলিনবাবু লাঠি খেলা শিক্ষা দিতেছেন



পুলিনবিহারী দাস

৺অতুলকৃষ্ণ ঘোষ

লাঠির অন্যতম সুদক্ষ খেলোয়ার ৺অতুলকৃষ্ণ ঘোষ বড় লাঠিখেলায় সুবিখ্যাত। শিক্ষিত ও ভদ্র দলে তিনিই বড় লাঠির খেলা সংহতভাবে ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রথম প্রচলন করেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় যখন জাতির মনে শারীর সামর্থ্য লাভের একটা প্রচণ্ড ইচ্ছার উন্মেষ হইল সেই সময়ে কলিকাতা সহরে সিমলা ব্যায়াম-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময় হইতে অতুলবাবু ছেলেদের লাঠি শিখাইয়া আসিতেছিলেন। জীবনের শেষ দিনও ইহাই তাঁহার একমাত্র সাধনা ছিল। বড়ই দুঃখের বিষয়, গত কার্ত্তিক মাসে (১৩৩৪ সাল) তাঁহার পরলোক গমন হইয়াছে।

অতুলবাবুর লাঠির হাতে খড়ি হয় সুবিখ্যাত লাঠিয়াল ৺কাঞ্চন সর্দ্দারের নিকট। কাঞ্চন সর্দ্দার ও রূপ সর্দ্দার দুই ভাই ছিল। এরা ছিল বিখ্যাত রঘু ডাকাতের শিষ্য। রঘু ডাকাতের নামে এককালে বাঘে মহিষে এক ঘাটে জল খাইত। সরকারের হুকুমে যখন রূপ সর্দ্দারের ফাঁসি হইল, তখন কাঞ্চন গা ঢাকা দিয়া হাওড়া জেলার উলুবেরিয়ার অধীন নতিপপুরে বাস করিত। সেই সময়ে বালক অতুলকৃষ্ণ তাহার শিষ্য হইলেন এবং লাঠি খেলায় পারদর্শিতা লাভ করিলেন। ইহার পরও অতুলবাবু লাঠি শিখিবার জন্য সমগ্র ভারতবর্ষে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। অতুলবাবু বলিতেন, সারা ভারতবর্ষ ঘুরিয়া

বেড়াইলাম, আমার গুরুর খেলার তুলনা পাইলাম না। অমন খেলোয়ার আর একটি মিলিল না। স্বদেশীর যুগে এলাহাবাদ কংগ্রেস মণ্ডপে নিখিল ভারত লাঠি-প্রতিযোগিতায় খেলিয়া অতুলবাবু সর্ব্বোচ্চ পদক পাইয়াছিলেন।

আশানন্দ ঢেঁকী

এই সকল আধুনিক শিক্ষিত লাঠিখেলোয়ার ছাড়া দেশে আর একদল লাঠিয়াল আছে যাহারা উত্তরাধিকার সূত্রে এই লাঠির চর্চ্চাটা বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। এই দেশী লাঠিয়ালের দল আজিও লাঠির ঘায়ে সবুজ মাঠ রাঙা করিয়া তোলে, শুভ্র বালুকাময় চরভূমি রক্তায়িত করে। ইহারাই ছিল পূর্ব্বকার ভূস্বামীদিগের ঢালী সৈন্য (পদাতিক)।

আশানন্দ ঢেঁকী ইহাদেরই একজন ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে আশানন্দের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে দেশের চোর-ডাকাত অস্থির থাকিত। আজিও তাহার কত স্মৃতি-কাহিনী, কত অলৌকিক গল্প লোকের মুখে মুখে ভাসিয়া ভাসিয়া বিস্ময়ের উদ্রেক করে। আশানন্দ নদীয়া-নিবাসী এক ব্রাহ্মণ সন্তান। একবার তিনি লাটের খাজনা লইয়া যাইতেছিলেন। পথে রাত্রি হওয়াতে এক বাড়ীতে আশ্রয় লইলেন। একদল ডাকাত তাহার টাকার সন্ধান পাইয়া, তাহাকে আক্রমণ করিল। আশানন্দ সেকালের নাম-করা লাঠিয়াল ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ হাতের

কাছে আত্মরক্ষার কোন কিছু পাইলেন না, পাইলেন একটা ঢেঁকী। সেই প্রকাণ্ড ঢেঁকী ঘুরাইতে ঘুরাইতে ডাকাতের দল আক্রমণ করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। ইহার পর তিনি আশানন্দ ঢেঁকী নামেই সমধিক পরিচিত হইয়া উঠিলেন।

সে-সময় দস্যু-তস্করের উপদ্রব খুব বেশী ছিল। আর একবার আশানন্দ অনেক টাকা লইয়া কালেক্টরীতে যাইতেছিলেন। সঙ্গে মোটেই জনকয়েক পাইক। এমন সময় হঠাৎ প্রায় দুই শত দস্যু তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। আশানন্দ ভীত হইবার লোক নন। তিনি সদর্পে লাঠিমাত্র সম্বল লইয়া তাহাদের সম্মুখীন হইলেন। সাম্‌নে আসিয়াই হঠাৎ দুইটি ডাকাতকে একেবারে বগলে পুরিয়া ফেলিলেন। দস্যু দুইটি অনেক চেষ্টায়ও বন্ধনমুক্ত হইতে পারিল না। এই অসম্ভব ঘটনা দেখিয়া ডাকাতের দল ছুটিয়া পালাইল। আশানন্দ সেই অবস্থায়ই কালেক্টর সাহেবের কাচারীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। লোকে বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া রহিল। কালেক্টর সাহেবও আশানন্দকে সাহসের যোগ্য পুরস্কার দিলেন।

আজ দেশের নানাস্থানে লাঠির চর্চ্চাটা আবার আরম্ভ হইয়াছে। অনেক সঙ্ঘ-সমিতি ও স্কুল-কলেজে লাঠির চর্চ্চা চলিতেছে। মেয়েরাও লাঠি ও ছোড়া খেলিয়া আত্মরক্ষায় সমর্থ হইতেছে। জাতির এই নূতন উদ্যম সফল হোক্, জাতি সবল ও সক্ষম হইয়া উঠুক।

তরুণ বাঙ্‌লার শারীর-সম্পদ্

একদিন বাঙালীর স্বাস্থ্য ও শরীরের অনুপম সৌষ্ঠব দেখিয়া শতবর্ষ পূর্ব্বে লর্ড মিণ্টো লিখিয়াছিলেন—

"I never saw so handsome a race. They are much superior to the Madras people, whose form I admired also. Those were slender. These are tall, muscular, athletic figures, perfectly shaped and with the finest possible cast of countenance, and features. The features are of the most classical European models, with great variety at the same time."

যাহাদের অতুলনীয় শরীর-সম্পদ্ বিদেশীয়দিগেরও বিস্ময় উদ্রেক করিত, আজিকার বাঙালীর ম্লান, শ্রীহীন ও কঙ্কালসার চেহারা দেখিয়া কে বলিবে ইহারাই শতবর্ষ পূর্ব্বের পৌরুষ বাঙালীর বংশধর ?

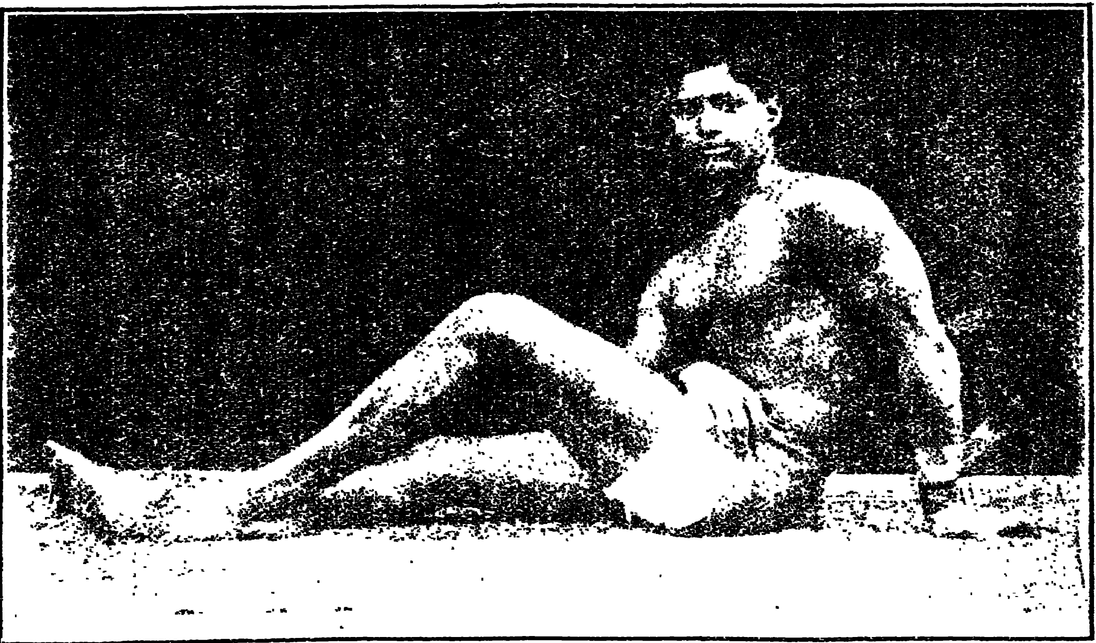
এই অতি-বড় দুঃখের পশ্চাতে যে বিষাদময় অতীত লুক্কায়িত রহিয়াছে, সে করুণ ইতি-কথা না-ই বা বলিলাম। বাঙালীর শরীর-সম্পদের ধ্বংসের ইতিহাস অতি করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী।

তারপর অনেক কাল পরের কথা। বাঙালীর জীবনে সেদিন এক পুণ্যতিথি, যেদিন বাঙালী ৺নবগোপাল মিত্র প্রমুখ নেতৃ-

* Lord Minto's Letter dated the 20th. September 1807 quoted in A Dying Race—How dying by K. L. Sarcar.



শ্রীসত্যপদ ভট্টাচার্য্য



শ্রীভূপেশচন্দ্র কর্ম্মকার

বৃন্দের উদ্যোগে স্বদেশী-মেলায় শরীর-চর্চ্চার কঠোর প্রয়োজনীয়তা চোখ মেলিয়া দেখিতে পাইল। সে বছর পঁচিশেক আগেকার কথা। সেই স্বদেশী যুগের প্রারম্ভ হইতে বাঙালীর শরীর-সাধনা ফল্গুর নিরবচ্ছিন্ন ধারার মত ধীরে ধীরে বহিয়া চলিয়াছে। বিশেষ ভাবে বিগত কয়েক বৎসর হইতে এই শরীর-চর্চ্চার আন্দোলন সারা দেশময় ব্যাপিয়া পড়িয়াছে। ইহারই ফলে আমরা একদল তরুণ যুবক পাইয়াছি, যাহারা শরীর সাধনায় সাফল্য লাভ করিয়া বাঙালীর লুপ্ত দেহ-শ্রী ও অঙ্গ-সৌষ্ঠব ফিরাইয়া আনিয়াছেন। তাহাদেরই জন-কয়েকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেওয়া হইল। ইঁহাদের পরিচয়ে তরুণ বাঙ্‌লার প্রাণে উৎসাহের নবধারা নামিয়া আসুক।

শ্রীভূপেশচন্দ্র কর্ম্মকার

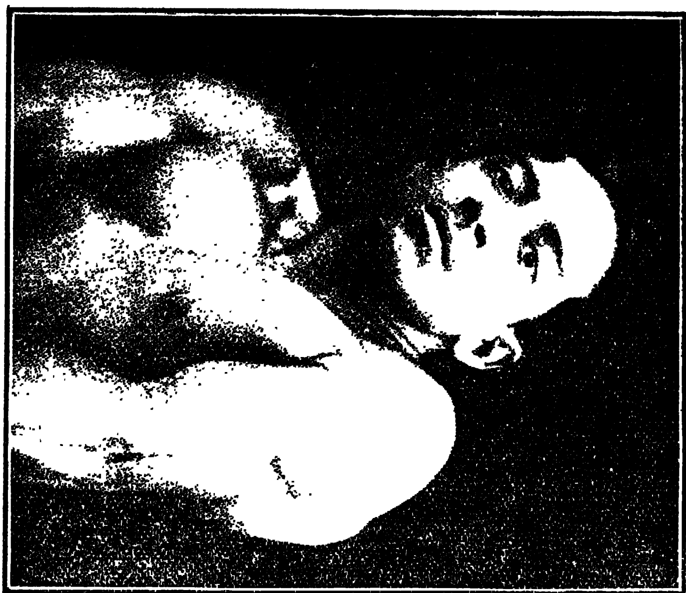
ইহার বয়স কুড়ি বছর; রিপন কলেজের বি-এস্‌সি ক্লাশের ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। ১৯২৭ সালে কলিকাতায় যে All India Best Physique Competition হইয়াছিল তাহাতে ইনি শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। অথচ ইহার দুই বছর পূর্ব্বে যখন প্রোঃ ঠাকুরতার নিকট ব্যায়াম শিখিতে আরম্ভ করেন, তখন ইহার শরীরে খানকয়েক হাড় ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় নাই। কিন্তু আজ প্রাচীন গ্রীসীয় অতুলনীয় শরীর-সৌষ্ঠবও ইহার দেহ-শ্রীর নিকট হার মানে।

শ্রীসত্যপদ ভট্টাচার্য্য

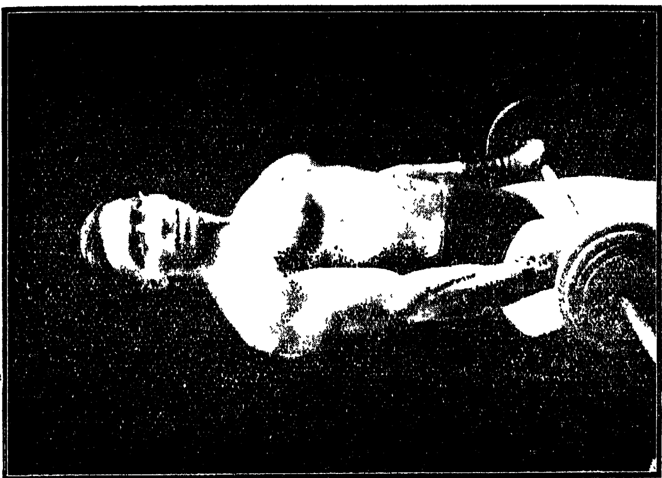
ইহারও বয়স কুড়ি বছর এবং রিপণ কলেজেই বি-এস্‌সি ক্লাশের ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়েন। ভার উত্তোলনে অদ্বিতীয়। এখনই তিন মণ ওজন উত্তোলন করেন। বাঙালীর সাধারণ খাদ্য ডালভাতই ইহার নিত্যকার আহার। ১৯২৫ সালে যখন প্রোঃ ঠাকুরতার নিকট ব্যায়াম-চর্চ্চা আরম্ভ করেন তখন ইহার স্বাস্থ্য ও শরীর সাধারণ রকম ছিল। দেড় বছর নিয়মিত ব্যায়াম-চর্চ্চার ফলে আজ এই নয়ন-লোভন শরীরখানি গঠিত হইয়াছে। এই বয়সেই ইহার বুকের বেড় ৪৮ আট চল্লিশ ইঞ্চি।

শ্রীপ্রমোদেশ্বর বসু

ইহার বয়স একুশ বছর। ইনি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে বি-এ ক্লাশে পড়িতেন। ইনি একই-দিকে চলন্ত দুখানা মোটর টানিয়া রাখিতে পারেন, লৌহদণ্ড বাঁকা করিতে পারেন, মোটর অ্যাক্সিডেণ্ট (motor accident), Fatal jump ও human bridge প্রভৃতিও করিতে পারেন। ইনি এসকলই নিজে নিজে অপরের সাহায্য ব্যতীত শিক্ষা করিয়াছেন। ইনি প্রথমে বুকডন, বৈঠক, মুগুর-ভাজা ও কুস্তি করিতেন, বর্ত্তমানে বারবেল ও বারের কসরৎ করিয়া থাকেন। বছর দেড়েকের ব্যায়াম-চর্চ্চার ফলে ইহার শরীরের এই চমৎকার উন্নতি লাভ হইয়াছে। ইহার ওজন ১৭০ পাউণ্ড ; বুকের বেড় ৪৩½ ইঞ্চি, বাহু (Bicep) ১৫ ইঞ্চি।







শ্রীসুবোধচন্দ্র মুখার্জি

ইহার বয়স বাইশ বছর; বি-এস্‌সি পরীক্ষার্থী। প্রোঃ ঠাকুরতার শিক্ষকতায় দুই বছর নিয়মিত ব্যায়াম-চর্চ্চার ফলে ইহার অতি সুন্দর সুস্পষ্ট ও সুগঠিত মাংসপেশীসমূহ (Clear-cut heavy muscles) গঠিত হইয়াছে। আড়াই মণ ওজন অনায়াসে তুলিতে পারেন।

শ্রীবিজয়কুমার মল্লিক

ইহার বর্ত্তমান বয়স মাত্র ১৮ বছর। ছোটকালে ইহার শরীর অতি ক্ষীণ ছিল; বাধ্য হইয়া সেকেণ্ড ক্লাশেই পড়াশুনায় ক্ষান্ত দিতে হয়। লিভার অতি খারাপ ছিল, চোখের দৃষ্টি এত ক্ষীণ হইয়াছিল যে তিন হাত দূরের লোক পর্য্যন্ত চিনিতে পারিতেন না। সকলেই তাহার জীবনের আশা একরূপ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ইনি বিষ্ণুচরণ প্রভৃতির শরীর-চর্চ্চা দেখিয়া সঙ্কল্প করিলেন, শরীর ভাল করিবেনই। ক্রমান্বয়ে দেড় বছর (একদিনও বাদ না দিয়া) ব্যায়াম-চর্চ্চার ফলে ইহার শরীরের এই অসাধারণ উন্নতি ও পরিপুষ্টি হইয়াছে। এককালে যাহার হাড়গুলি একটি একটি করিয়া গোনা যাইত, আজ তাহার দেহের মাংসপেশীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইতে হয়।

শ্রীবিষ্ণুচরণ ঘোষ

বাঙালীর মধ্যে ইনি বোধ হয় প্রকাশ্যভাবে সাধারণের নিকট muscle control (মাংসপেশীর স্বেচ্ছানুরূপ সঞ্চালন) দেখাইয়া

প্রথম প্রশংসা অর্জ্জন করেন। ছোটকালে ইহার শরীর নেহাৎ সাধারণ রকমের ছিল এবং অতিশয় রোগা ছিলেন। ইহার muscle controlএ অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়া অনেক সাহেবও ইহার নিকট শিক্ষা লাভ করিতে আসিয়া থাকেন। যুযুৎসু বিদ্যায়ও ইহার যথেষ্ট পারদর্শিতা আছে।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন

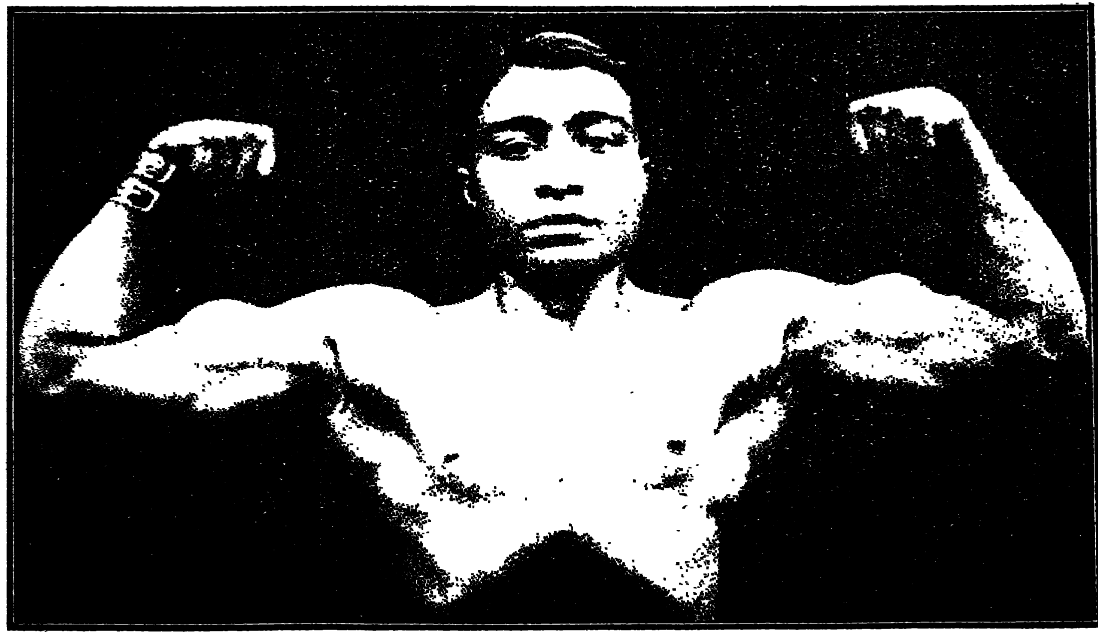
ইহার বয়স চব্বিশ বছর। কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষার্থী। ভার-উত্তোলন ও bar-bendingএ ইঁহার অসাধারণ দক্ষতা।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র দাস

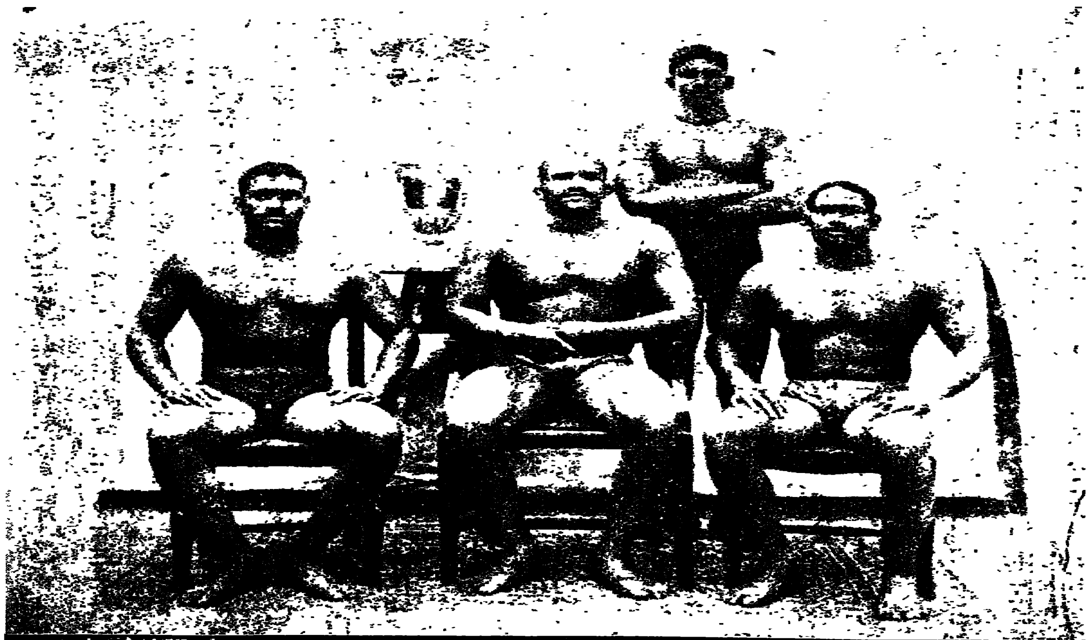
যে ছেলেটি একদিন ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া ভুগিয়া ও অজীর্ণে ক্ষীণ হইয়া কোন রকমে প্রাণের প্রদীপটী জ্বালাইয়া রাখিয়াছিল, আজ তাহারই অসাধারণ শক্তি-সামর্থ্যের কথায় বিস্মিত হইতে হয়। ঢাকা সহরে অনুকূলের নাম কাহারো অপরিচিত নয়। তাহার মোটর-রোখা ঢাকা সহরকে প্রথম বিস্মিত করিয়া তোলে। বুক দিয়া ঠেলিয়া চলন্ত মোটর রোখা ইহার কৃতিত্ব। বছর কয়েকের নিয়মিত ব্যায়াম-চর্চ্চার ফলে অজীর্ণ রোগী অনুকূল আজ এমন শরীর-সামর্থ্য লাভ করিয়াছেন। ইনি ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বি-এ ক্লাশের ছাত্র ছিলেন।

শ্রীবনমালী ঘোষ ও তাহার ভাই সকল

বনমালী ঘোষ, গোবর বাবুর নাম-করা শিষ্য ও খ্যাতনামা পালোয়ান। ইনি গোবর বাবুর সঙ্গে আমেরিকায় গিয়াছিলেন



শ্রীবিষ্ণুচরণ ঘোষ



গোবর বাবুর সুযোগ্য শিষ্য শ্রীবনমালী ঘোষ (মধ্যস্থলে উপবিষ্ট)

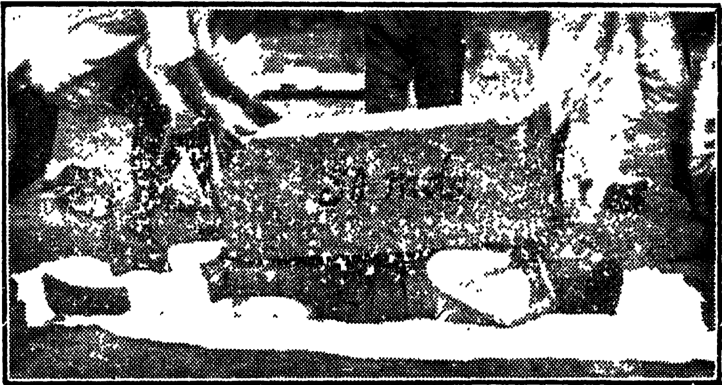
শ্রীপ্রকাশ ঘোষ (দণ্ডায়মান—শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ) শ্রীহাবী ঘোষ

এবং অনেকের সঙ্গে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত কুস্তি লড়িয়াছেন। ইঁহার দুই ভাই শ্রীহৃষী ঘোষ বি-এ ও শ্রীপ্রকাশ ঘোষ বি-এস্‌সি ; এরাও ভাল কুস্তিগীর। হৃষী ঘোষ ভার-উত্তোলনে দুইবার All Bengal Weight Lifting Cup লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতাস্থ আহিরীটোলায় বসন্তকুমারের পৈতৃক বাস-ভবন। ইহাঁর বয়স ২৩ বৎসর। সবেমাত্র মেডিকেল ইন্‌ষ্টিটিউট্ হইতে পাশ করিয়া বাহির হইয়াছেন। অথচ এই বয়সেই ইনি এত বিচিত্র রকমের নানাবিধ ব্যায়াম-চর্চ্চায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন যাহা বস্তুতঃই গর্ব্ব ও গৌরবের বিষয়। বাল্যকাল হইতেই বসন্তকুমার ব্যায়াম-চর্চ্চায় অভ্যস্ত। দাঁতে ও হাতে শিকল ছেঁড়া, ৬।৭ মন ওজনের কামানের গোলা শূন্যে ছুঁড়িয়া তাহা ঘাড়ে ও পিঠে লওয়া, দাঁত দ্বারা টাট্টু তোলা ইত্যাদি শক্তিক্রীড়ায় বসন্তকুমার যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। বুকে হাতী তোলা ও গুরুভার প্রস্তর খণ্ড ধারণ করা (প্রায় ৫০ মণ) তাহার অন্যতম শক্তিক্রীড়া। চেয়ারে ঘাড় ও গোড়ালি রাখিয়া সমস্ত শরীর সাঁকোর মত করিয়া স্বর্গীয় শ্যামাকান্তের ন্যায় বুকে পাথর চাপা দিয়া তদুপরি হাতুরীর ঘা' মারা হইয়াছে, বসন্তকুমার ধৈর্য্য সহকারে সহ্য করিয়াছেন। একাধিক মোটর গাড়ী ও লরি (মালগাড়ী) একই দিকে ধাবমান হইলে (মোটর গাড়ী

৪।৫ খানা ও লরি ২ খানা) টানিয়া রাখিতে পারেন। লোক বোঝাই ২ খানা মহিষের গাড়ী ও ২৭০ মণ ওজনের রোলার বুকে লইতে পারেন। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি কৌতুকপ্রদ রোমাঞ্চকর খেলা দেখাইয়া বসন্তকুমার কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন। শায়িত অবস্থায় বসন্তকুমার ৭ হাত চওড়া ও ১৬ হাত লম্বা



শ্রীবসন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়—বুকে পাথর চাপাইয়া তাহার উপর হাতুড়ির ঘা মারা হইতেছে

একখানি মই পায়ের উপর ধারণ করেন এবং উহার উপর ৮।১০ জন বালক উঠিয়া নানারূপ কসরৎ করিতে থাকে। নাকের উপর একটি বাঁশ ধারণ করেন—উহার অগ্রভাগে পা-বাঁধা একটি বালক নানারকম কসরৎ দেখাইতে থাকে। তীরের খেলা, বন্দুকের খেলা, ছোরার খেলা ইত্যাদিতেও বসন্তকুমার অভ্যস্ত হইয়াছেন।

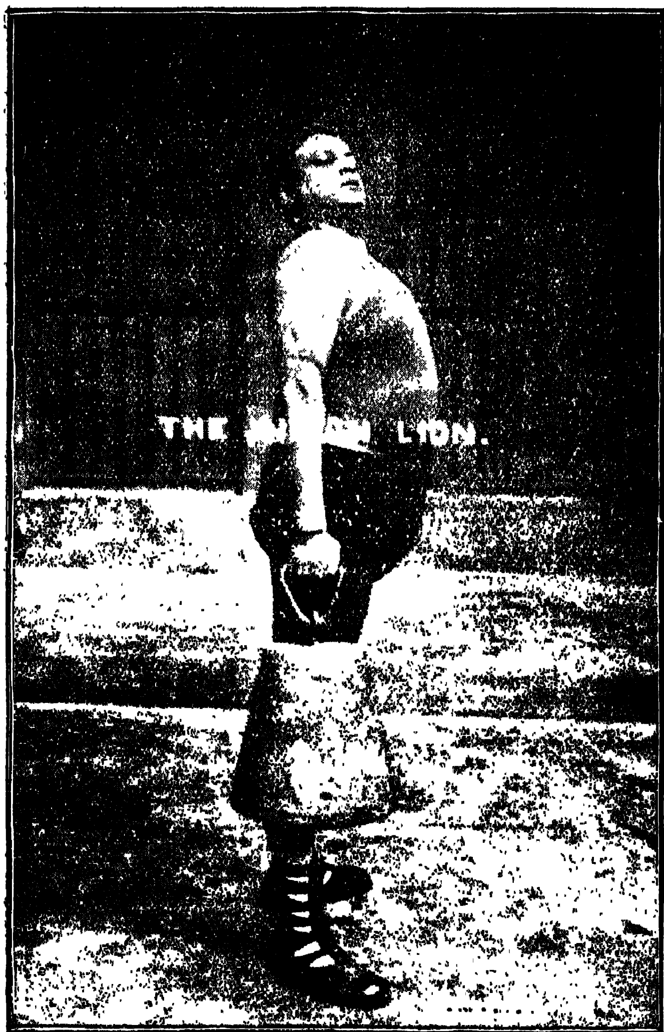
বসন্তকুমার এক্ষণে শরীর-চর্চ্চা বিস্তারে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন। এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি ব্যায়াম-শালা প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্যায়াম শিক্ষা দিতেছেন।

শ্রীষোড়শী কুমার গাঙ্গুলী

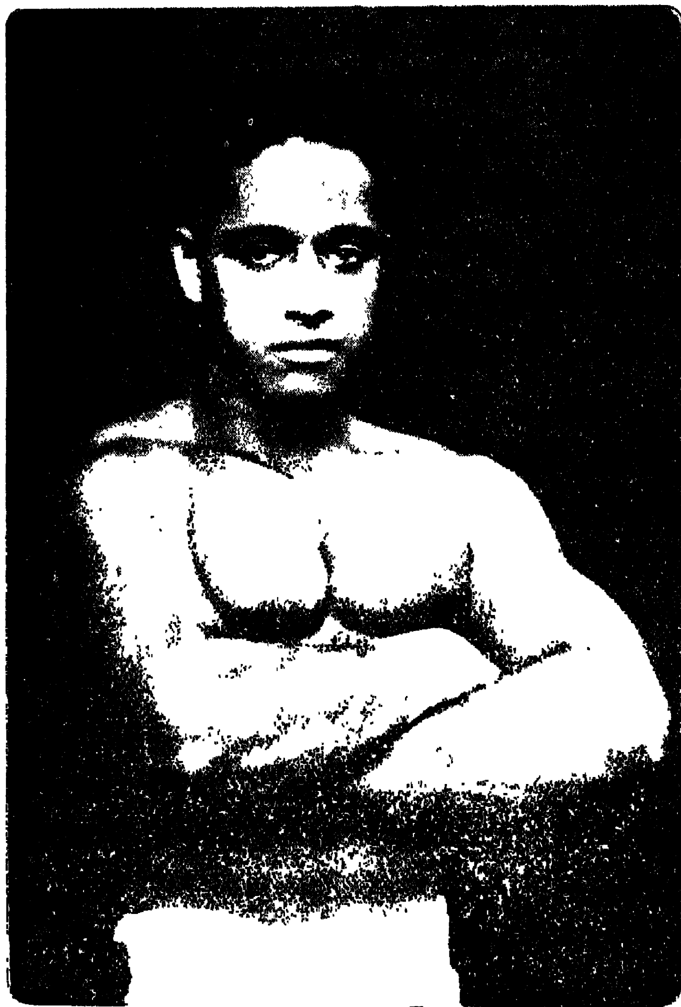
কলিকাতা ভবানীপুর আশুতোষ কলেজের ছাত্র। বিদ্যালয়ে পড়িবার সময় হইতেই ব্যায়াম-চর্চ্চায় ইনি মনোনিবেশ করেন। ইনি দাঁত দ্বারা চারি মণ ত্রিশ সের ওজনের গুরুভার তুলিতে পারেন। ইহা ব্যতীত মোটর রোখা, টালীভাঙ্গা, পেশী সঞ্চালন প্রভৃতিতে ইনি কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ইহাঁর বর্ত্তমান বয়স ২২ বৎসর।

শ্রীদিগেন্দ্রচন্দ্র দেব

ইহাঁর বাড়ী মৈমনসিংহ জেলায়। মুক্তাগাছা হাই স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া মৈমনসিংহ কলেজে পড়েন। এই সময়ে মৈমনসিংহের বিখ্যাত ব্যায়াম-বীর শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রমোহন সেনের নিকট ইনি বিশেষ ভাবে ব্যায়াম-চর্চ্চা করেন। বর্ত্তমানে ইনি তিনখানি মোটর গাড়ীর গতিরোধ করিতে পারেন, বুকের উপর ১০৮ মণ ভার ধারণ করিতে পারেন, দেড় ইঞ্চি গোলাকার লৌহদণ্ড বক্র করিতে এবং এক হাতে দেড় মণ ভার উত্তোলন করিতে পারেন। এতদ্ব্যতীত লাঠিখেলা, তলোয়ার খেলা, ধনুর্বিদ্যা, সড়কি খেলা প্রভৃতিতে ইনি বিশেষ



শ্রী বসন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়



শ্রীষোড়শী গাঙ্গুলী

পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। দুর্ব্বৃত্তের হাত হইতে অসহায় রমণীদিগের উদ্ধার-কার্য্যে ইনি যথেষ্ট কৃতিত্ব ও সাহস প্রদর্শন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ইনি বিএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় আইন পড়িতেছেন এবং শরীর-চর্চ্চা শিক্ষা দানে নিযুক্ত আছেন। ইহাঁর শরীরের বর্ত্তমান মাপ এইরূপ— উচ্চতা—৫'১১"; বুক—৪৩"; পুরোবাহু (Bicep)—১৭½"; কটী—৩২"; উরু—২৬"; কব্জি—১৬½"।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার ঘোষ

সাঁতার কাটা একটী উৎকৃষ্ট ব্যায়াম। পূর্ব্বে আমাদের দেশের প্রায় সকলেই ইহাতে অভ্যস্ত ছিল। পাড়া-গাঁয়ের জলাশয়গুলিকে সন্তরণ-প্রিয় ছেলেমেয়ের দল মুখরিত করিয়া তুলিত। সহরের আবেষ্টনে এই সহজ আনন্দটি আমাদিগের নিকট হইতে দূরে চলিয়া গিয়াছিল। ইদানীং কলিকাতা, ঢাকা প্রভৃতি বড় বড় সহরে এ বিষয়ে বেশ একটা সাড়া আসিয়াছে। আজ আমাদের পরম গৌরবের কথা, বাঙালী ছেলে প্রফুল্লকুমার দীর্ঘকাল সন্তরণে পৃথিবীর সকলের উপরে উঠিয়াছেন। প্রফুল্লকুমার ১৯৩০ সালের ৩০শে অগাষ্ট শনিবার ভোর ৬টা ৮ মিনিটের সময় কলিকাতার কর্ণওয়ালীশ ট্যাঙ্কে (হেঁদুয়া) সাঁতার কাটিতে নামেন। ক্রমাগত ৬৭ ঘণ্টা ১০ মিনিট সাঁতার কাটিয়া মঙ্গল বার রাত্রি ১টা ১৮ মিনিটের

সময় জল হইতে উঠিয়া আসেন। তাহাকে কর্ণওয়ালীশ ট্যাঙ্ক ২৭৪ বার পারাপার হইতে হইয়াছিল।

এ যাবত এবিষয়ে পৃথিবীতে প্রথম স্থান করিয়াছিলেন আর্থার রেজো নামক এক ব্যক্তি—৬২ ঘণ্টা ছিল তাহার সাঁতারের দৌড়। প্রফুল্লকুমার উনত্রিশ বৎসর বয়স্ক পূর্ণ যুবক। ইতোমধ্যে তিনি বহুস্থানে সন্তরণ-প্রতিযোগিতায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। আমরা আশাকরি, তাঁহার মাথায় বাঙালীর এই যশের মুকুট স্থায়িত্ব লাভ করুক। প্রফুল্লকুমার সম্প্রতি ইংলিশ চ্যানেল সন্তরণ করিবার জন্য বিলাত যাত্রা করিবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন।

বাংলার বাহিরে বাঙালী ব্যায়াম-বীর

ব্যায়াম-বীর বর্ষাত বাবু

বিহারের রাজধানী বাঁকীপুরে 'শূরোদ্যান' নামে তত্রত্য বাঙালীদের একটি ব্যায়ামাগার আছে। প্রায় ষাট বৎসর পূর্ব্বে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে বহু বাঙালী যুবক ও বালক স্বাস্থ্য ও শক্তি লাভ করিয়া যশস্বী হইয়াছে। স্বর্গীয় অমরনাথ রায় এই ব্যায়ামাগারের অন্যতম উৎসাহী সভ্য ছিলেন। অমরনাথ ১৮৬৫ খৃঃ অব্দে পিতার কর্ম্মস্থান মোতিহারীতে জন্মগ্রহণ করেন। পাটনার সার্ভে স্কুল হইতে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া তিনি ওভারসিয়ারি পদে নিযুক্ত হন।

"পাটনায় অবস্থান কালে অমর বাবু শূরোদ্যানে যোগদান করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই একজন বলবান্ পুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। একদিকে তাঁহার বিশাল বক্ষ, উন্নত গ্রীবা ও ললাট, দীর্ঘ সুগঠিত পেশল দেহ তাঁহার বীর্য্যব্যঞ্জক শারীরিক সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিয়া তাঁহাকে সুদর্শন করিয়া ছিল, অন্যদিকে তাঁহার ধীর-নম্র অমায়িক প্রকৃতি তাঁহাকে আবালবৃদ্ধ সকলের প্রিয় এবং বাঙালী বিহারী সকলের নিকট সম্মানিত করিয়াছিল। বাল্যকালে প্রতি বর্ষায় তাঁহার প্রায়ই ফোড়া হইত বলিয়া শূরোদ্যানের সম্পাদক মজুমদার মহাশয় তাঁহাকে 'বর্ষাত্তি' এই নাম দিয়াছিলেন।

"প্রায় কুড়ি একুশ বৎসর হইল, এলাহাবাদে একটি ভারত-

বর্ষীয় ব্যায়াম-প্রদর্শনী খোলা হয়। তাহাতে ভারতের নানাস্থান হইতে অনেক হিন্দু-মুসলমান-শিখ পালোয়ান এবং ইংরেজ গোরা স্ব স্ব শক্তি প্রদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। বিহারের তৎকালীন নেতা স্বনামপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় গুরুপ্রসাদ সেন মহাশয় সেই নিখিল ভারতীয় মল্ল-ক্রীড়া প্রদর্শনীতে প্রতিযোগিতা করিবার জন্য বাঁকীপুর হইতে বাঙ্গালী বীর বর্ষাতিবাবুকে আপন খরচায় এলাহাবাদ পাঠাইয়া দেন। তথায় বল পরীক্ষণীয় অন্যান্য যন্ত্রমধ্যে একটি স্প্রীং পিসটন বা চাপদণ্ড (Spring piston) রক্ষিত হইয়াছিল। যিনি ঐ পিস্‌টনে অঙ্কিত ১৯ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া দণ্ডটিকে ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিতে পারিবেন, তাঁহারই জিৎ হইবে। কিন্তু পিস্‌টনে হাত না দিয়া কেবল বুক দিয়া বুকেরই জোরে ঠেলিতে হইবে। কি পশ্চিমা পালোয়ান, কি শিখ, কি গোরা, উপস্থিত কেহই যখন সে পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, তখন যুবক অমরনাথ অগ্রসর হইয়া পিস্‌টনে বক্ষ সংলগ্ন করিয়া সবলে তাহা ১৯ চিহ্ন পর্য্যন্ত ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। দর্শকমণ্ডলী আনন্দ-ধ্বনি ও প্রশংসাবাণীতে প্রদর্শনীস্থল মুখরিত করিয়া তুলিলেন।

"বর্ষাতি বাবুরা চার সহোদরে যখন আহার করিতে বসিতেন, তখন তাহাদের আহার্য্যের পরিমাণ দেখিবার বস্তু হইত। এক একজনের পাত্রে যে রুটির গোছা উপর্য্যুপরি সাজাইয়া দেওয়া হইত তাহা পাত্র হইতে প্রায় কণ্ঠ পর্য্যন্ত উঁচু হইত।

"দুঃখের বিষয় প্রবাসী বাঙ্গালীদের গৌরব চিরকৌমার্য্যব্রতী নিরামিষ-ভোজী বিমল-চরিত্র অমরনাথ দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি বংশগত বহুমূত্র রোগে ৪৫ বৎসর বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।"

ড্রিল ও প্যারেড্

বাঙ্‌লাদেশে শরীর চর্চ্চা এক নবরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে ১৯২৮ সালের কলিকাতা কংগ্রেসের পর হইতে। কংগ্রেসের উক্ত অধিবেশনের সময় হইতেই ড্রিল ও প্যারেড বাঙালী যুবকদের প্রাণে এক নবচেতনা আনিয়াছে। ব্যায়াম-চর্চ্চার মধ্যে ড্রিলের মত এমনটি আর নাই। জাতীয় জীবনকে পরিপূর্ণ ও শক্ত-সমর্থ করিবার এমন শিক্ষা আর নাই। দেশের সৌভাগ্য, আজ এদিকেও জাতির নজর পড়িয়াছে। ১৯২৮ সালের কলিকাতা কংগ্রেসে অতি অল্প সময়ে যেরূপ সুসংহত ও সুশিক্ষিত ভলাণ্টিয়ার-দল গঠিত হইয়াছিল, উহাতে আশা ও ভরসা খুবই হয়। দেশের নানাস্থানেই আজ ড্রিলের চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে; সুনিয়ন্ত্রিত হইলে অদূর ভবিষ্যতে দেশের এই ম্লান চেহারা বদলাইয়া দিতে পারে। এই কংগ্রেস উপলক্ষে ড্রিল ও প্যারেডে মেয়েরাও যেরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা বস্তুতঃই প্রশংসনীয়।

কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেনিং কোর এবিষয়ে কিছু কিছু সাহায্য করিতেছে। আবার কিছুকাল মধ্যেই ড্রিল ও ব্যায়ামাদি উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছেলেদেরও অবশ্য-করণীয় বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। ইহা আশার কথা, সন্দেহ নাই।

মেয়েদের ব্যায়াম-চর্চ্চা

'বাংলাদেশের শ্যাম্‌লা মেয়ে গা তোলো গো, চোখ মেলো।'

মেয়েদের ব্যায়াম-চর্চ্চায় এতদিন দেশ একেবারে উদাসীন ছিল। আজকাল বাংলায় নারী-জাগরণের একটা সাড়া আসিয়াছে। ইহারই ফলে আমাদের দৃষ্টি জাতির অর্দ্ধ-চৈতন্য এই নারীসমাজের উপরেও পড়িয়াছে। এতদিন আঙ্গিনার পারিপার্শ্বিকের মধ্যে নারীর কর্ম্মগণ্ডী নির্দ্দিষ্ট ছিল, আজ সেই গৃহলক্ষ্মীর আহ্বান আসিয়াছে, তাঁহাকে বিশ্বের সকল কর্ম্মযজ্ঞে যোগ দিতে হইবে। ঘরে ও বাহিরে, গৃহে ও সমাজে নারীকে আজ আপনার দানে ও কর্ম্মে সকল শূন্যতা ও দীনতা পূর্ণ করিয়া লইতে হইবে—জাতিকে পরিপূর্ণ জীবনের আস্বাদ দিতে হইবে। যে কর্ম্মশক্তি এতদিন সঙ্কীর্ণ সীমার স্বাস্থ্যহীন গণ্ডীর ভিতরে আবদ্ধ ছিল, আজ সেই নারীশক্তির কর্ম্মপ্রেরণা জগৎকে সুন্দর ও সার্থক করিয়া তুলিতে অগ্রসর হইয়াছে। তাই আজ তাঁহার দৃষ্টি পড়িয়াছে, তাঁহার শ্রীহীন কঙ্কালসার শরীরখানির উপর।

শারীরিক শক্তি-সামর্থ্য লাভ করিয়া দেহকে কর্ম্মপটু করিবার জন্য নারীসমাজে একটা নব প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। ব্যক্তিগত ভাবে শরীর-চর্চ্চা অনেককাল হইতেই ধীরে ধীরে চলিয়া আসিতেছিল। সেই স্বদেশীর যুগে বাঙ্‌লার মহিমময়ী বীরমাতা শ্রীযুক্তা সরলা দেবী ইহার প্রথম প্রচলন করেন। তাঁহার প্রচেষ্টা শুধু বাঙ্‌লার পুরুষকে নয়, বাঙ্‌লার নারীসমাজেও একট চেতনা

আনে। বীরাষ্টমী সমিতি ইহারই ফল। তারপর বিগত কয়েক বছর হিন্দু-মুস্লিম দাঙ্গাহাঙ্গামা ও নারী-নির্য্যাতনের ফলে বাঙ্গালার নারীসমাজ আপনার শারীর-সামর্থ্য লাভের জন্য একান্ত ভাবে আত্মনিয়োগ করিলেন, দেশের নানাস্থানে লাঠি, ছোরা, যুযুৎসু প্রভৃতি আত্মরক্ষার সহজ ও অব্যর্থ উপায়গুলি আয়ত্ত করিতে লাগিলেন। ইহারই ফলে অনেকগুলি মহিলা-প্রতিষ্ঠানে শরীর-চর্চ্চা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিল। এবিষয়ে কলিকাতার দুই একটি মহিলা-প্রতিষ্ঠান ও ঢাকার দীপালি সঙ্ঘ বিশেষ অগ্রবর্ত্তী। মেয়েদের লাঠি, ছোরা, যুযুৎসু প্রভৃতি নিয়মিতভাবে শিখানো হইয়া থাকে।

বাঙালী মেয়ের শরীর-সাধনার এই নব উদ্যম ও নূতন গতি জয়যুক্ত হোক্।

পরিশিষ্ট

সরল ব্যায়াম-প্রণালী

আমাদের দেশের প্রচলিত বুকডন ও বৈঠক সকলের পক্ষেই করা সহজ। উহাতে শরীরের সর্ব্বাঙ্গেরই সঞ্চালন হয়। নিম্নে কয়েকটি সহজ প্রক্রিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইল।

ব্যায়াম নং ১ (বুকডন)

১। ক-চিত্রটির মত মাটিতে হাত ও পা এক এক হাত অন্তর স্থাপিত কর, পূর্ণ নিঃশ্বাস লও, দম বন্ধ রাখ এবং খ-চিত্রটির মত অবস্থান কর। তারপর গ-চিত্রটির মত বুক নীচে নামাও এবং ঘ-চিত্রটির মত কোমর নীচু করিয়া ঘাড় ও বুক উচু করিয়া উক্ত অবস্থা লও এবং সাথে সাথে নিঃশ্বাস ছাড়িয়া দাও।

সময়—প্রত্যেক চালনা ৪ সেকেণ্ড।

বার—৫ হইতে আরম্ভ করিয়া ১০০ পর্য্যন্ত।

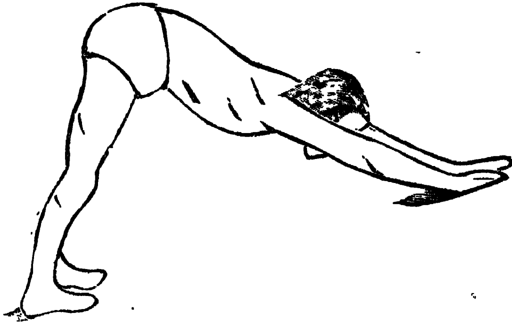
ব্যায়াম নং ২ (বৈঠক)

২। দুই পা পরস্পর এক ফুট অন্তরে সরলভাবে দাঁড়াও, সম্মুখে তাকাও, পূরা নিঃশ্বাস লও, এবং সোজাভাবে উবু হইয়া বস, সঙ্গে সঙ্গে নিঃশ্বাস ছাড়। এইরূপে করিতে থাক।

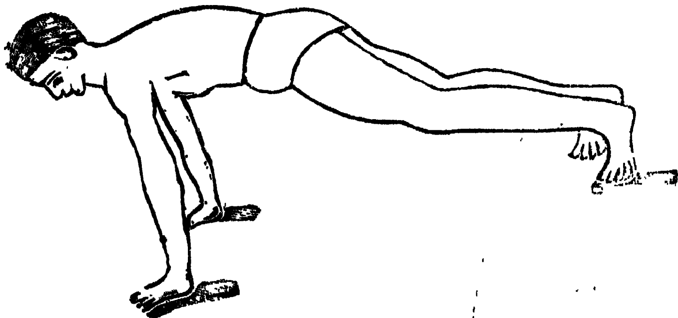
সময়—প্রত্যেক বৈঠক ২ সেকেণ্ড।

বার—১০ হইতে ২০০ পর্য্যন্ত।

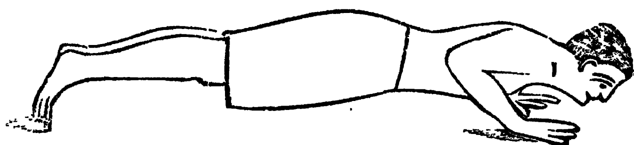
চিত্র ক



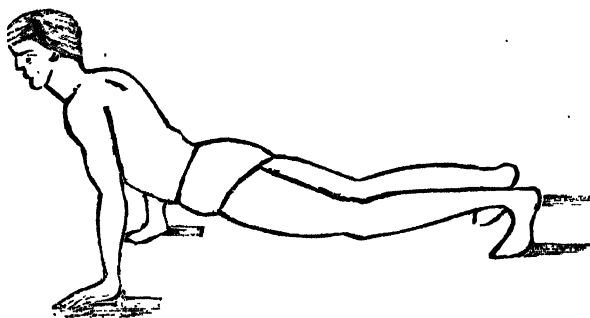
চিত্র খ



চিত্র গ



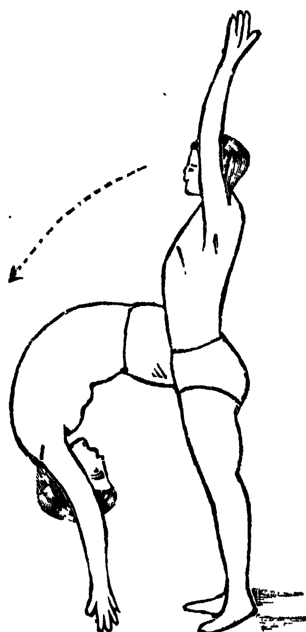
চিত্র ঘ



ব্যায়াম নং ৩

৩। ঙ-চিত্রের মত সোজা হইয়া দাঁড়াও, দুই পা এক ফুট অন্তর রাখ, দুই হাত একত্রে সোজা ভাবে উঁচু কর। তারপর নিঃশ্বাস লও, পা হইতে কোমর পর্য্যন্ত শরীরটি সোজাভাবে রাখিয়া শরীরের উপরিভাগ ধীরে ধীরে চিত্রটির মত বাঁকাইয়া হাতদ্বারা মাটি স্পর্শ কর এবং নিঃশ্বাস ছাড়। আবার পূর্ব্বাবস্থা গ্রহণ কর। সময়—প্রত্যেক চালনা ৩ সেকেণ্ড বার—১০ হইতে ১০০ পর্য্যন্ত।

চিত্র ঙ



এই কয়টি ব্যায়াম প্রত্যহ অন্ততঃ আধ ঘণ্টা যোগ-সাধনার মত নিষ্ঠার সহিত করিলে প্রত্যেকেই শক্তিশালী ও নীরোগ হইতে পারে।

ব্যায়ামের সাধারণ নিয়ম

১। প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময় ব্যায়াম করা উচিত, অনেক ব্যায়াম-গীর সপ্তাহে একদিন ব্যায়াম বাদ দেন।

২। যে-কোন প্রকার ব্যায়াম করা বা খেলার সময়, কথা বলা বা শব্দ করা বা বাজে আলাপ করা সম্পূর্ণ অনুচিত।

৩। প্রত্যহ প্রাতঃকালে শৌচকর্ম্মাদি করিবার পর খালি পেটে ব্যায়ামই প্রকৃষ্ট। অনেকে অতি সামান্য কিছু খাবার খাইয়া ব্যায়াম করিয়া থাকেন।

৪। ব্যায়াম করিবার সময় মুখ দিয়া নিঃশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। নাসিকাদ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস লইতে হয়।

৫। ল্যাঙট, কৌপীন, জাঙ্গিয়া বেশ ভাল করিয়া পরিয়া ব্যায়াম করা উচিত। ল্যাঙ্‌ট বা কৌপিনাদি না পরিয়া কখনও ব্যায়াম করা উচিত নয়।

৬। ব্যায়ামাদি করিবার সময় অস্বাভাবিক ভাব বর্জ্জনীয়। অনেকে ব্যায়ামের সময় দাঁত মুখ খিচাইয়া থাকেন। উহাতে শরীরের সুগঠন ও সুডৌল নষ্ট করিয়া ফেলে।

৭। উপযুক্ত পরিশ্রম না হওয়া পর্য্যন্ত এক দমে ব্যায়াম করা উচিত।

৮। সম্ভবপর হইলে আয়নার সামনে ব্যায়াম করিলে উন্নতি দ্রুত হইয়া থাকে।

৯। ব্যায়াম করিবার সময় মন যেন বিক্ষিপ্ত না থাকে। শুধু নিজের শরীরের উপরই মনটিকে নিবদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করা উচিত।

১০। সর্ব্বোপরি নৈতিক চরিত্রের উপর কঠোর দৃষ্টি রাখা উচিত। ইন্দ্রিয়-সংযম ও ব্যায়াম পরস্পর সাপেক্ষ ও সহায়ক।